১২ বছর পূর্তি

ঊর্মি

Residential Laboratory College

TRUST
ASSURANCE
DEPOSIT
SCHEME
Attractive Insurance Policy
with inbuilt insurance premium
5/7/10 years of tenure
Early Encashment Policy
For a
GUARANTEED
FUTURE
* Your deposit is insured
Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion
16201
TrustBankLtdBD
www.tblbd.com

HEAVEN FORBID
Mishaps & Misfortune
can strike
"ANY SECOND"
Protect against
the horror of
financial burden
that follows
Marine
Personal
Accident
Travel
cancer/kidney failure/
Stroke/Heart disease
etc etc
Hospitalisation
Plan
Fire
Open the umbrella of a BGIC policy
1st Private Sector Non Life Insurance Company in Bangladesh
BGIC
বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
Bangladesh General Insurance Company Ltd.
Service is Our Strength
Client Service Station
+88-02-47113983
bgicinsurance@yahoo.com
bgicinsurance@gmail.com
www.bgicinsure.com

সম্পাদনা

মীর লিয়াকত আলী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ বার্ষিকী

উৎসর্গ

বসুন্ধরা গ্রুপ

সম্পাদক

মীর লিয়াকত আলী

সম্পাদকমন্ডলী

প্রফেসর আজিজুর রহমান (কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান)

প্রফেসর বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য (প্রিন্সিপাল)

মীর লিয়াকত আলী (সদস্য, গভর্ণিং বডি)

প্রভাষক এনামুল হক

প্রভাষক শারমিন আক্তার মৌ

প্রকাশনা

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ,

উত্তরা, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০২২ ইংরেজী।

প্রচ্ছদ ঃ সুহৃদ মেহবুব

কম্পোজ ঃ এটিবি কম্পিউটর্স, উত্তরা, ঢাকা।

মূদ্রণ ঃ কলেজ প্রেস

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ পাঁচশ' টাকা

সামগ্রিক তত্বাবধান ঃ প্রফেসর আজিজুর রহমান

URMI, RESIDENTIAL LABORATORY CPLLEGE MAGAZINE,
Edited By Mir Liaquat Ali. Published By Residential Laboratory College
House No 59 Road No 7 Sector 4 Uttara, Dhaka. Price BDT 500 $ 10

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে 'ঊর্মি' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদ ও শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শুধু একাডেমিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীনতার চেতনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম। সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের যুগপূর্তিতে 'ঊর্মি' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। জাতির উন্নয়ন ও অগ্রতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রণীত রুপকল্প ২০২১ এর মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও উন্নত, সমৃদ্ধ, সুখী, শান্তিময় বাংলাদেশের ২০৪১ এর রুপকল্প বাস্তবায়নে, ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে, ২১০০ সালের বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সকল অংশীদার হবার জন্য দক্ষ ও জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুনাবলী সম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। 'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সরকার পাঠ্যক্রমকে আরও যুগোপযোগীকরন, মূল্যায়ন পদ্বতি পরিমার্জন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা চাই শিক্ষা হবে আনন্দময়। শিক্ষার্থীদের আমরা জ্ঞান, দক্ষতা ও সঠিক মনোভাবের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমি আশা করি সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ রুপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়নে অংশীদার হবে।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ সুশিক্ষার প্রসার ও মানসম্পন্ন মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরির মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকবে এ প্রত্যাশা রইল। কলেজ বার্ষিকী 'ঊর্মি' প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আমার অফুরন্ত ভালোবাসা ও শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(ডাঃ দীপু মনি, এমপি)

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে 'ঊর্মি' নামে বার্ষিকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সুষ্ঠু সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও সুপ্ত প্রতিভাকে আরো বেশি বিকশিত করে। রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তুলে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উন্নয়নকে সুসংহত করতে প্রয়োজন দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী। সে কারণেই শেখ হাসিনা সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, গুণগত শিক্ষার সম্প্রাসারণ,নারীদের শিক্ষার স্রোতে সম্পৃক্ত করা, উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব সরকার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।মহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষার্থীরা যেভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অবদান রেখেছে, আমি আশা করি রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের শিক্ষার্থীরা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ এবং নৈতিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে নিরলস ভাবে কাজ করবে।

আমি রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ওবায়দুল কাদের এমপি

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বানী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এর যুগপূর্তি উপলক্ষে 'উর্মি' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অদ্যম গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সায়েন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাফল্যের অংশীদার হতে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের আশাবাদ। উচ্চতর নৈতিক মান অর্জনের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এই কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' এর বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ উর্মি প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা এবং শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এমপি

মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' এর যুগপূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটির এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের আলোকোজ্জ্বল বিভা ও বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের বিস্তীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা,স্বাধীন বাংলাদেশের চৈতন্যে দেশপ্রেম,বিশ্ববোধ, বিজ্ঞান-মনস্কতা,অপার নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে -বৈশ্বিক মেরুকরণে : জাতি হিসাবে আজ আমাদের অর্জন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

গণমূখী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকরী প্রণয়ন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে বিকশিত করতে পারে বলে আমি মনে করি।অপরূপ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী সুশিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

'রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে উদারনৈতিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যদিয়ে সংস্কৃতিমান মানুষ গঠনে ভূমিকা রাখছে-আমি তার প্রশংসা করি।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেম ও কর্মজীবনে দেশের মানুষের জন্য তাদের দায়িত্বশীল কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আগামীর গৌরবোজ্জ্বল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড.এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি)

মন্ত্রী
পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাজধানী ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত ' রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' এর যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে 'ঊর্মি' শিরোনামে একটি কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

কলেজ বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মননশীলতা এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ষিকী প্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই, এ ধরনের কলেজ বার্ষিকী নিয়মিত প্রকাশের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফলের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি কলেজটির শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে আমার প্রত্যাশা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। সরকার দেশের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পূর্বক দেশবাসীকে বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বায়ূদূষণ,পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকরী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ' রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' এর শিক্ষাথীরা ও শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ রোধে এবং বৃক্ষরোপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে, এ কলেজ বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম পি

প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষে কলেজ বার্ষিকী "ঊর্মি" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ গড়ার কারিগর। এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলোকবর্তিকা হয়ে এর চারপাশে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয় শিক্ষা, সংস্কৃতি , দেশপ্রেম ও সচেতনতার আলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছেন। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষার্থী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, আমি রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মাহবুব আলী, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা-১০০০

বাণী

মুক্তিযুদ্ধের আলোকোজ্জ্বল বিভা ও বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের বিস্তীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা, স্বাধীন বাংলাদেশের চৈতন্যে দেশপ্রেম, বিশ্ববোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা, অপার নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে- বৈশ্বিক মেরুকরণে: জাতি হিসাবে আজ আমাদের অর্জন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

প্রণমুখী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকরী প্রণয়ন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে বিকশিত করতে পারে বলে আমি মনে করি। অপরূপ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্ঠায় নিকট ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

'রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে উদারনৈতিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিমান মানুষ গঠনে ভুমিকা রাখছে-আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করি। কলেজের বার্ষিক ক্রোড়পত্র প্রকাশিতব্য 'উর্মি' একযুগ পূর্তি উপলক্ষে একটি মাইলফলক। ক্রোড়পত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিক্ষাবিষায়ক নতুনচিন্তার প্রকাশে উৎকৃষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে-আগামীর হীরণ্য গৌরবোজ্জ্বল বাংলাদেশ গঠনে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মুক্তিযুদ্ধের আলোকাজ্জ্বল বিভা ও বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের বিস্তীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা, স্বাধীন বাংলাদেশের চৈতন্যে দেশপ্রেম,বিশ্ববোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা, অপার নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে-বৈশ্বিক মেরুকরণে : জাতি হিসাবে আজ আমাদের অর্জন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

গণমুখী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকরী প্রণয়ন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে বিকশিত করতে পারে বলে আমি মনে করি। অপরূপ রাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টায় নিকট ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

' রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে উদার নৈতিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিমান মানুষ গঠনে ভূমিকা রাখছে-আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করি। কলেজের বার্ষিক ক্রোড়পত্র প্রকাশিতব্য 'উর্মি' একযুগ পূর্তি উপলক্ষে একটি মাইলফলক। ক্রোড়পত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিক্ষাবিষায়ক নতুনচিন্তার প্রকাশে উৎকৃষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে-আগামীর হীরণ্য গৌরবোজ্জ্বল বাংলাদেশ গঠনে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এর যুগপূর্তি উপলক্ষে 'উর্মি' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অদ্যম গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সায়েন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাফল্যের অংশীদার হতে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের আশাবাদ। উচ্চতর জাতিক মান অর্জনের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এই কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' এর বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ উর্মি প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা এবং শুভকামনা।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাণী

মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল বিভা ও বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের বিস্তীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। স্বাধীন বাংলাদেশে চৈতন্যে দেশপ্রেম, বিশ্ববোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা, অপার নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে-বৈশ্বিক মেরুকরণে জাতি হিসাবে আজ আমাদের অর্জন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

গণমুখী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে বিকশিত করতে পারে বলে আমি মনে করি। অপরূপ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টায় নিকট ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

' রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে উদারনৈতিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিমান মানুষ গঠনে ভূমিকা রাখছে- আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করি। কলেজের বার্ষিক ক্রোড়পত্র প্রকাশিতব্য 'উর্মি' একযুগ পূর্তি উপলক্ষে একটি মাইলফলক। ক্রোড়পত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিক্ষাবিষয়ক নতুনচিন্তার প্রকাশে উৎকৃষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে- আগামীর হীরণ্য গৌরবোজ্জ্বল বাংলাদেশ গঠনে একাত্মতা ঘোষণা করছি। জয় বাংলা।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

বাণী

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এর যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে বার্ষিকী 'উর্মি' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। কলেজের শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক সাফল্যের গল্প শুনে আরো ভালো লাগছে। পরীক্ষার ফলাফল, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও পাঠ্যক্রম বর্হির্ভূত কর্মকান্ডে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-নর সাফল্য অন্যদের জন্য উদাহরন হয়ে থাকবে। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ছাত্র,শিক্ষক,অভিবাবক ও পরিচালনা পর্ষদের সকলকেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কঠোর পরিশ্রম,দৃঢ় মনোবল,নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে এ কলেজটি অচিরেই একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগী জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চর্চা বৃদ্ধিল করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প -২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সকলকে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক-অভিবাবক সকলেই এ বিষয়ে সচেতন ও আন্তরিক আছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে সকলে আত্মনিয়োগ করবেন এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

'উর্মি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সকলের সাফল্য কামনা করছি।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বিটাক, শিল্প মন্ত্রণালয়

বাণী

মুক্তিযুদ্ধের আলোকোজ্জ্বল বিভা ও বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের বিস্তীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। স্বাধীন বাংলাদেশে চৈতন্যে দেশপ্রেম, বিশ্ববোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা, অপার নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে-বৈশ্বিক মেরুকরণে: জাতি হিসাবে আজ আমাদের অর্জন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

গণমুখী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকরী প্রণয়ন একটি জাতিকে সর্বতোভাবে বিকশিত করতে পারে বলে আমি মনে করি। অপরূপ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টায় নিকট ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

' রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে উদারনৈতিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিমান মানুষ গঠনে ভূমিকা রাখছে- আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করি। কলেজের বার্ষিক ক্রোড়পত্র প্রকাশিতব্য 'উর্মি' একযুগ পূর্তি উপলক্ষে একটি মাইলফলক। ক্রোড়পত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নতুনচিন্তার প্রকাশে উৎকৃষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে- আগামীর হীরণ্য গৌরবোজ্জ্বল বাংলাদেশ গঠনে একাত্মতা ঘোষণা করছি। জয় বাংলা।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রফেসর তপন কুমার সরকার
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বাণী

"আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়,যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।"
---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এর যুগপূর্তি উপলক্ষে ঊর্মি নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কে সমুন্নত রাখতে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার ও জনগণকে শতভাগ শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সায়েন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের আশাবাদ। প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও উচ্চতর নৈতিক মান অর্জনের প্রয়াসে এই কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের একান্ত কামনা।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ ঊর্মি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা ও শুভকামনা।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রফেসর তপন কুমার সরকার

বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম **রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ**। শিল্প, সৌকর্য ও যুগোপযোগী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে এ কলেজ বদ্ধপরিকর। একটি ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি কয়েকজন শুভাকাঙ্খীকে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করি ২০০৯ সাল থেকে। আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস, মনোবল এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফসল আজকের **রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ**।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ সূচনালগ্ন থেকেই ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে আসছে। কলেজের অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষাপদ্বতি শিক্ষার্থীদের উত্তম ফল অর্জনে সহায়ক। এ কথা ভেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ এক পা, দুই পা করে এক যুগ পূর্ণ করেছে। ১২ বছরের অধিক সময়ে কলেজটি নির্মাণ করেছে সংখ্যাতীত সাফল্যের গৌরবগাঁথা এবং প্রমান করেছে, জ্ঞান অর্জনের দুয়ার এখানে সর্বজনের জন্য অবারিত। কলেজটি কেবল বিজ্ঞান শাখার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার অন্যতম অভিনিবেশ হিসেবেও বিবেচিত। শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে পাঠক্রমিক কার্যক্রম। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয় কলেজ বার্ষিকী 'ঊর্মি'। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের কোমল মনের আবেগ, অনুভূতি তথা শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, গল্প, ভ্রমন অভিজ্ঞতা ও ধাঁধা প্রভৃতি চর্চা করতে পারে। এটি পাঠ্যক্রমের বাইরে তাদের মেধা বিকাশের অপার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করে। দেশ ও জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার যে প্রয়াস, 'ঊর্মি' প্রকাশনার উদ্যোগ তারই একটি অংশ। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাধুবাদ জানাই।

রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজের যুগপূর্তিতে কলেজ বার্ষিকী 'ঊর্মি' তে তুলে ধরা হচ্ছে এ কলেজের ১২ বছরের সোনালি সাফল্যগাথা। এ সাফল্যগাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোঃ আজিজুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ

প্রফেসর বনমালী মোহন ভট্টচার্য্য
অধ্যক্ষ
রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

মানুষের কল্পলোকের কল্পলতায় নানান চিন্তা-অনুচিন্তা নিরন্তর পল্লবিত হতে থাকে। এর মধ্যেই নিহিত থাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ। অঙ্কুরোদগমের যথাযথ পরিবেশের অভাবে অকালমৃত্যু ঘটে অসংখ্য অনাগত চিন্তাবৃক্ষের। শিক্ষকদের কাজ সেইসব চিন্তাবৃক্ষের বিকাশ ঘটানো; নিত্য বহমান খরা পরিবেশ আর বালুময় মরুভূমিতে সঞ্চারিত রসে প্রতিভা-পুষ্পের স্ফুটন। সরকারি বিজ্ঞান কলেজ আজ একদল সৃজনশীল তরুণের পদচারণায় মুখরিত। আর তাদের প্রত্যাশাপূরণে সার্বক্ষণিক অগ্রগামী ভূমিকায় রয়েছেন কলেজের কর্মোদ্যমী শিক্ষক ও নিবেদিত কর্মকর্তাগণ। সকলের চেষ্টাকর্মের সমন্বয়ে কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন নতুন করে এক আলোর দ্বার উন্মুক্ত করেছে আমাদের জন্য। এ মহান কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে তাই ধন্য মনে করছি।

প্রফেসর বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য

বাণী

একটি স্বপ্নের বাস্তব রুপায়ন হলো 'রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ' যা ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করে সময়ের পরিক্রমায় আজ মহীরুহে পরিনত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান অরাজনৈতিক পরিবেশে শিক্ষার গুনগত মান বজায় রেখে শিক্ষার দীপ্তি ছড়িয়ে চলেছে এবং চলবে অনন্তকাল। একঝাঁক তরুন মেধাবী শিক্ষকের আন্তরিক কর্ম-প্রচেষ্টায় ১ম ব্যাচেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মেধা তালিকায় ১৯ তম স্থান অর্জন করে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেই থেকে রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ পরিনিত হয় এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিষ্ঠানে। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই কলেজের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী মেধাবী ও মননশীল শিক্ষার্থী গড়তে এ কলেজটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।
শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ কলেজ ম্যাগাজিন 'উর্মি) সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উদ্ভাসিত হবে। কলেজের সার্বিক সাফল্য ও এক সমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করে 'উর্মি' প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

নুসরাত জাহান
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর
(রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ)

শিক্ষকমণ্ডলী পরিচিতি

মোঃ আজিজুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ

বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ
রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরী কলেজ

এজাজুল সরকার
প্রভাষক
জীববিজ্ঞান

সোহেল আনোয়ার
প্রভাষক
গণিত

কামরুন নাহার
প্রভাষক
রসায়ন বিজ্ঞান

কৃতী বাবু ত্রিপুরা
প্রভাষক
রসায়ন বিজ্ঞান

শিক্ষকমণ্ডলী পরিচিতি

মেহেদী হাসান
প্রভাষক
পদার্থ বিজ্ঞান

মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রভাষক
পদার্থ বিজ্ঞান

এনামুল হক সরকার
প্রভাষক
যুক্তিবিদ্যা

নাজমুন নাহার
প্রভাষক
বাংলা

মোঃ রিংকু রহমান
প্রভাষক
বাংলা

জারিন তাসনিম
প্রভাষক
যুক্তিবিদ্যা

শিক্ষকমণ্ডলী পরিচিতি

শারমিন আক্তার
প্রভাষক
হিসাব বিজ্ঞান

মোহাম্মদ এরশাদ মিয়া
প্রভাষক
হিসাব বিজ্ঞান

মোহায়মিনুল হক অপু
প্রভাষক
হিসাব বিজ্ঞান

নজরুল ইসলাম
প্রভাষক
ইংরেজি

মেহেদী মোবাশ্বের
প্রভাষক
মার্কেটিং

শারমিন মৌ
প্রভাষক
মার্কেটিং

শিক্ষকমণ্ডলী পরিচিতি

নুসরাত জাহান
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর

প্রতাপ মল্লিক
কাম এডমিন

মাহমুদা আকতার
প্রভাষক
আইসিটি

তাসলিমা তামান্না শিলা
অফিস স্টাফ

শাকিলা খানম
প্রভাষক
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

শ্যামলী আক্তার
হিসাব রক্ষক

শিক্ষকমণ্ডলী পরিচিতি

নুসরাত জাহান নিতু

আনিকা আনজুমান সামিয়া
কাউন্সিলর

আহসান হাবিব
কম্পিউটার অপারেটর

সম্পাদকীয়

যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ম্যাগাজিন প্রকাশ সেই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য রুচিসহ বিভিন্ন বিশেষত্বকে তুলে ধরতে পারে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সেতুবন্ধন রচনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিভা বিকাশের সুতিকাগার হিসাবেও ম্যাগাজিনের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারনত শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পর স্বাভাবিকভাবেই নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা সহজে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ম্যাগাজিনের লেখা থেকে এসব অজানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়েই থাকে। যা তাদের জানার আগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করে। নিজের শ্রেনী ছাড়া অন্যান্য শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের ধ্যান ধারনা আদানপ্রদানও সহজ হয়। আধুনিককালে সিলেবাসে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই প্রেক্ষাপটে ম্যাগাজিন প্রকাশকে অধিক গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর বহু জ্ঞানী গৃণিজনের প্রথম লেখা ম্যাগাজিন থেকে উঠে এসেছে বলে দৃষ্টান্ত রয়েছে। আগেই বলেছি ম্যাগাজিনকে প্রতিভা তৈরীর সুতিকাগারও বলা হয়ে থাকে। এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অন্যান্য লিটল ম্যাগ জার্নাল পত্র পত্রিকায় লেখার স্পৃহা সাহস ও মেধা সঞ্চয় করা সহজতর হয়। এর মাধ্যমে জ্ঞান তথ্য আদানপ্রদান সহজ হয়। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনথের 'গীতাঞ্জলি'র ছয়টি গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো এজরা পাউন্ড সম্পাদিত বিশ্ববিখ্যাত 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিন থেকে। যা পরবর্তীতে নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। অন্যান্য ম্যাগাজিনের মতো কলেজ ম্যাগাজিনও সর্বদাই কলেজ ও কলেজের বাইরে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট সকলেই এটা সংগ্রহে রাখার প্রয়াস নেয়। এর মাধ্যমে রচিত হয় একটি অনন্য সেতুবন্ধন!

রেসিডেন্সিয়্যাল ল্যাবরেটরী কলেজ রাজধানী ঢাকার একটি অন্যতম সেরা কলেজ। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক যুগেরও বেশি সময় উল্লেখযোগ্য ফলাফলসহ বিভিন্নভাবে কলেজটি লাইমলাইটে উঠে আসে।

কিন্তু সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রতিকুলতায় কলেজটি অনাকাঙ্খিতভাবে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বর্তমানে কলেজটি সকল প্রতিকুলতা নিরসনকল্পে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে কলেজ থেকে ম্যাগাজিন 'ঊর্মী' স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করছে, যা সবাইকে উজ্জীবনী ছোঁয়ায় আলোর পথে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

'ঊর্মী' প্রকাশে স্বয়ং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রিন্সিপাল, শিক্ষক শিক্ষার্থী ছাড়াও নেপথ্যে প্রকাশ্যে বিভিন্নভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমরা তাঁদের প্রতি জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। আমরা সবার শুভকামনা প্রত্যাশা করি যাতে আগামীতে আমরা আমাদের এই প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখতে পারি। 'ঊর্মী'র আবাহনে সবাইকে নতুন-ভাবে আপ্লুত করুক আমাদের এই শুভ্র কামনা অত্যন্ত আন্তরিক।

মীর লিয়াকত আলী
সম্পাদক, ঊর্মী ॥ সদস্য কলেজ গভর্ণিং বডি।
উত্তরা ঢাকা ॥ অক্টোবর এক, দু'হাজার বাইশ।

ঊর্মি

ফারুক নওয়াজ

সাগর যখন আবেগে অধীর ফেঁপে ওঠে নীলজল
মেঘছোঁয়া সুখে হয়ে ওঠে তার ঊর্মিরা উচ্ছল।...
ঊর্মি মানেই সৃজনের মহা সৃষ্টির কলরোল...
ঊর্মি মানেই পাড়ভাসা খুশি হৃদয়ের হিন্দোল।...

মহাপৃথিবীর সৃষ্টির ক্ষণে এমনই পড়েছে সাড়া...
কঠিন মাটির অন্ড়র ফুড়ে সাগর দিয়েছে নাড়া...
সৃষ্টিনেশায় দিকহারা হয়ে হাওয়া গেছে বয়ে বয়ে...
সহস্র তটিনী জল-উল্লাসে ছুটেছে ঊর্মি হয়ে।..

জীবন জীবন মেধার চর্চা চলেছেই ক্রমাগত...
নবসৃষ্টির অবিরাম ধ্যানে মানুষ থেকেছে ব্রত...
মানুষ ভেবেছে কিভাবে আকাশে বিজুলিকা চমকালো...
এমনিভাবেই আঁধার পৃথিবী মানুষ করেছে আলো।...

অতীত পৃথিবী ছিল কষ্টের, গুহায় কেটেছে নিশি...
যাতনা ঘোচাতে নতুন পৃথিবী গড়ল মানবঋষি।..
প্রকৃত অর্থে মেধার দীপ্তি জীবনে এনেছে গতি;
সৃজনের ঢেউ আঁধার তাড়িয়ে দূর করে দুর্মতি।

চিরন্তন কবিতা

শেখ ফজলল করিম

স্বর্গ ও নরক

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক,
কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক,
মানুষেতে সুরাসুর!

রিপুর তাড়নে যখনি মোদের
বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগানির নরক-অনলে
তখনি পুড়িতে হয়।

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

শিশু-অধিকার প্রসঙ্গ

ডক্টর সেলু বাসিত

সমাজ পরিবর্তনে শুধু নয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী লক্ষ নিয়ে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে কার্যকর কর্মসূচি, উদ্বুদ্ধকরণ ও সাংগঠনিক কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করে মনোজগৎ বিকাশের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। আজকের বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব আর সাম্প্রদায়িকতার সামাজিকীকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে সহমর্মিতা আর ভালোবাসার সম্পর্ক দিয়ে। শিশুদের মতামতের মর্যাদা দিতে হবে। প্রগতিশীল বিজ্ঞান মনস্ক এবং যুক্তিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশুদের সংগঠিত করতে হবে। ইতিবাচক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রবর্তণায় সম্ভব হবে এক মানবিক বাংলাদেশের, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার, সম্ভব হবে মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা। সকল শিশু সংগঠন কর্মী এবং সংগঠকদের শুধু নয়, অভিভাবক ও শিশু কিশোর তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। এই সচেতনতার অভাবে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, বঞ্চিত হয় সমস্যাসংঙ্কুল তরুণ সমাজ।

একটি মানব শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার কোন গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি পরিচয় থাকে না; উত্তরাধীকার সূত্রে তা আরোপিত হয়। মানব প্রজাতির সন্তান-ভুত-প্রেত বা অদৃষ্ট নির্ভর ধর্মান্ধতা, ইহলোকের সৃষ্টিশীল শিশুসত্ত্বাকে পারলৌকিক জীবন বিমুখতার মানব সত্তার বাইরে নানা লিঙ্গ পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে, চিন্তা চর্চাকে কু-সংস্কারে সীমাবদ্ধ করে প্রগতির পথকে বাধাগ্রস্থ করে। তাই চিন্তা চর্চাকে এগিয়ে নিতে শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, সর্বজনীন মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা ও অধ্যয়নের প্রচেষ্টা মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

সমাজ শিশুদের প্রতি কী-আচরণ করছে, শিশু-কিশোরদের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার পরিমাপ করা যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' মানুষের অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক চেনতা প্রকাশ করার এক মাইল ফলক স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে দুটি ধারা অধিকার করেছিল 'শৈশবে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা', 'সকল শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা' এবং 'অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা'র প্রসঙ্গ।

তারও আগে ১৯২৪ এর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক শিশু অধিকার সংক্রান্ত 'জেনেভা ঘোষণা পত্র' শিশুদের প্রতি বিশ্ব সমাজের প্রতিশ্রুতিরই লিপিবদ্ধ রূপ। এসব ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ এর ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ "শিশু অধিকার ঘোষণাপত্র" গ্রহণ করে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ঐতিহাসিক "শিশু অধিকার কনভেনশন" গ্রহণ করে সর্বসম্মতিক্রমে। বস্তুত শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশুদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, দাস ব্যবসা তথা শিশু কল্যাণের বিভিন্ন দিক বিষয়ে জাতিসংঘ গৃহীত বহুসংখ্যক প্রস্তাব ঘোষণাপত্র কনভেনশনে নানা প্রসঙ্গে শিশু অধিকার স্বীকৃত হয় নানা মাত্রায়।

জাতিসংঘ শিশু-অধিকার ঘোষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃত তাৎপর্যকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

"১. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, রাজনৈতিক ও অন্যবিধ বিশ্বাস, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে শিশুই সমান; ২. শিশুর বিশেষ নিরাপত্তা এবং তার জন্য মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক বিকাশের যোগ্য পরিবেশ ও আইনগত সুবিধা সৃষ্টি; ৩. ব্যক্তি হিসেবে শিশুর স্বীকৃতি; ৪. গর্ভাবস্থায় মায়ের নিরাপত্তা এবং শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা; ৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা; ৬. পরিবারের ভালোবাসা থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন না করা; ৭. বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা যার লক্ষ্য সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন, দক্ষতা বিকাশের সমান সুযোগ, আত্মবিবেচনা ও সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানের বিকাশ; শিশুর জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা; ৮. দুর্যোগে প্রথম সাহায্য লাভ; ৯. শিশু-নির্যাতন ও বঞ্চনা এবং শিশু-ব্যবসা দমন; শিশু শ্রম বন্ধ; ১০. সর্বপ্রকার বৈষম্যের অনুশীলন থেকে শিশুকে রক্ষা।

শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে এই ঘোষণাপত্র বিশ্বব্যাপী বিকল্পহীন দলিলরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা' গৃহীত হলে 'শিশু নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে শিশুকে রক্ষা এবং আইনগতভাবে শিশুশ্রম বন্ধে'-এ (ধারা-১০) বিধি গৃহীত হয়। এই চুক্তিনামায় শিশুমৃত্যু রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও প্রথমবারের মত বিধিবদ্ধ হয়।"

'শিশু-অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন' নিম্নোক্ত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

ক. ১৩ অনুচ্ছেদের মুখবন্ধ; খ. প্রথম পর্বে মোট ৪১টি ধারা; গ. দ্বিতীয় পর্বে মোট ৪টি ধারা; এবং ঘ. তৃতীয় পর্বে মোট ৯টি ধারা।

জাতিসংঘের যে কোনো দলিলে মুখবন্ধটি অলঙ্কারিক অংশ হলেও এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র লুপ্ত থাকে। যেমন কনভেনশনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে:

১. শিশুকে ভবিষ্যতে সমাজে সার্থক ব্যক্তিজীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, তাকে লালন করতে হবে শান্তি, মর্যাদা, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, সাম্য ও সংহতির আদর্শে; ২. বঞ্চিত শিশুদের অবস্থান রয়েছে পৃথিবীর সকল দেশেই; ৩. শিশুর বিকাশে তার ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে; ৪. পৃথিবরি যে কোন দেশের, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুদের জীবনযাপন উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দিয়ে ভাস্কর হয়ে উঠে আগামী দিনের শিশুমানস কেমন হবে অথবা শিশুকল্যাণের বিষয়টি শুধুমাত্র সম্পদের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল নয় কিংবা সমস্ত বিশ্বের শিশুদের আনন্দময় জবিনযাপনের দায়িত্ব জাতীয় দায়িত্বও বটে। কনভেনশনে একেবারে নতুন চিন্তাধারা সম্বলিত কয়েকটি বিধানও রয়েছে। যেমন, শিশু অপহরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান সম্বলিত ধারার একাংশে বলা হয়েছে যে, শিশুকে কেউ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে আটকে রাখতে পারবে না (ধারা-১৯)। ১৭ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, শিশুর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য গণমাধ্যমসমূহ পরিবেশন করবে; কিন্তু কোন ক্ষতিকর তথ্য যাতে শিশুদের মধ্যে প্রচারিত না হয়, রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশন গ্রহণের ফলে বিশ্বব্যাপী শিশু-কিশোরদের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলো এবং শিশু সংগঠক ও শিশু সংগঠনের দায়িত্ব ও সচেতনতা সৃষ্টির পথকে প্রসারিত করলো।

বর্তমান বিশ্বে এখনো প্রতি বছর সোয়া কোটি শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বের অনুর্ধ-পাঁচ বছর বয়সী-দের অর্ধেকই এখনও বাস করছে দারিদ্রসীমার নীচে। বিশ্বে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা আজকের দিনেও পাঁচ কোটিরও বেশী। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীদের মধ্যে ১২ কোটি শিশু স্কুলে যেতে পারে না আজও। ইউনিসেফের মতে, উন্নয়ন-শীল দেশগুলোর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ পরিণামে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। আর শিল্পোন্নত বিশ্বে অস্ত্রসজ্জার ব্যয়-বরাদ্ধ অবস্থান নিয়েছে শীর্ণ কলেবরে। বাংলাদেশও এই বাস্তবতা থেকে ভিন্ন নয়। শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন বিশ্বের বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের জীবনে নতুন আশার বাণী প্রজ্জ্বলিত করুক-এই প্রত্যাশা সচেতন বিশ্ববাসীর এবং বাংলাদেশের সচেতন প্রগতিশীল নাগরিকদের।

তথ্য সংকেত:

১. মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র-সেলু বাসিত কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রকাশনায়, অবনী প্রকাশ, ২০১৯, ঢাকা।

২. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ৫০ তম বার্ষিকী স্মারক সংকলন-১৯৯৮, ঢাকা।

ড. সেলু বাসিত ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পরিচালক,বিশিষ্ট লেখক গবেষক

স্মৃতিকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করে ঢাকায় আসলাম ১৯৬৫ সালে। অনেক দিন পর ঢাকায় আসা। সেই ১৯৬৫ সালে ঢাকা ছেড়েছি। তার পর আর আসিনি। পথ ঘাট ও তেমন চেনা নয়। তবু ও ঢাকায় আসতে হবে। তখন কুমিল্লা থেকে ঢাকা বি আর টি সি বাসের ভাড়া সম্ভবত: এক টাকা চার আনা। বিআরটিসির তখন নাম ছিল ইপিআরটিসি। ইস্ট পাকিস্তান রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন।

একদিন খুব ভোরে উঠে পড়লাম বাসে। তখন দেড় থেকে দু'ঘন্টা সময় লাগতো কুমিল্লা থেকে গুলিস্তান আসতে। তখনো বর্তমান কলা ভবন সম্পূর্ন্ন ভাবে প্রস্তুত হয় নি। ঢাকা মেডিকেলের দক্ষিন দিকের অংশে তখন ক্লাস হতো কিছু ক্লাস হতো সায়েন্স, এনেক্স ভবনে। একদিন চলে আসলাম। ভর্তি হবো ইংরেজি বিভাগে যদি ও আমার ইচ্ছা ছিলো পলিটিক্যাল সায়েন্স কিন্তু আমার আব্বা চাইলেন আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ি পিতৃইচ্ছা শিরোধার্য্য। ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন। ডাক সাইটে অধ্যাপক। ছাত্র ছাত্রীরা তার ভয়ে সর্বদা কম্পমান। ওনাকে দেখলে মনেই হবে না যে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হয়েছে। বাংলা কদাচিৎ বলেন। চলনে বলেন বৃটিশ। শীত গ্রীষ্ম সদাই স্যুট টাই পরিহিত। হাতে লর্ড চেম্বারলেনের ছাতা। ছাতা ঘুরাতে ঘুরাতে ডিপার্টমেন্টে ড. হোসাইন আসছেন। ব্যাস করিডোর ফাঁকা এমনই একদিন ডিপার্টমেন্টে ভর্তির ইন্টারভ্যু দেয়ার জন্য হাজির হলাম। ভর্তির ফরম জমা দেয়ার দিনই ডিপার্টমেন্টের এক সিনিয়র ছাত্র আমাকে দেখেই বল্লো হায় হায় তুমি তুমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হবে। হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছো ? তোমাকে ড: দেখলে এখুনি বের করে দেবে ফরম জমা নেওয়া তো দূরের কথা। ড: সাজ্জাদ হোসাইন কে তার ছাত্ররা সম্ভ্রমের সাথে হেড বা চেয়ারম্যান না বলে ড: বলে সম্বোধন করত। যাকগে ঐ দিন একটা সাদা হাফ শার্ট গায়ে ছিল।

পরের দিন আমার ভর্তির ইন্টারভ্যু সিনিয়দের পরামর্শ মতো ফুল শার্ট, ইংলিশ স্যু পায়ে দিয়ে পরের দিন ইন্টারভ্যু দিতে গেলাম। না তেমন ভয়ংকর কিছু ঘটেনি। সাদা মাটা ইন্টারভু মাকসীট একবার দেখে নিয়ে বেলটা টিপে বল্লেন নেকসট। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মধুর ক্যান্টিনে আসলাম। সবাই ঘিরে ধরলো কেমন হলো যা বলার বল্লাম। কিন্তু মধুর ক্যান্টিন দেখে হতাশই হলাম। এই সেই মধুর ক্যান্টিন ? টিনের একটা চালা ঘর। দেশ তোলপাড় করা ছাত্র আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকাগার।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু চেয়ার টেবিল রাখা এখানে ওখানে এক কাপ চা নিয়ে বসেছি মাত্র। তখনই আমার সাথে ভর্তিচ্ছু একজন পাশে এসে বল্ল কেমন হলো ইন্টারভ্যু এবং এই প্রথম একজন ছাত্র আমার সাথে বাংলায় কথা বল্লো। ডিপার্টমেন্টের কেউ বাংলায় কথা বলে না। সিনিয়রা তো বলেন ই না। আগামী কাল ভর্তির ফলাফল দেবে। আমাকে আবার কাল সকালে কুমিল্লা-ঢাকা বাস ধরতে হবে।

অবশেষে ভর্তি হলাম। মাত্র ১৬/১৭ জনকে ভর্তির জন্য সিলেক্ট করা হলো। অত:পর থাকবো কোথায়? ভর্তি তো হলাম। আপাতত কলা বাগানে আমার ফুফাতো বোনের বাসায় থাকব বলেই স্থির করলাম। আর ইতোমধ্যে আবাসিক হলে থাকার জন্য দরখাস্ত জমা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থেয়ে দরখাস্ত জমা দিতে চেয়ে বুঝলাম এতো সহজে এবং এতো তাড়াতাড়ি ও হলের সীট পাওয়া যাবে না। অবশ্য একটা উপায় আছে। পরিচিত কেউ থাকলে তার সাথে সীট শেয়ার করা। হলের ভাষায় ওটাকে ডাবলিং বলে। কিন্তু পরিচিত কাউকে পাই কোথায় ? হলে তখন ছাত্র ইউনিয়নের প্রাধান্য। হল এবং ছাত্র সংসদ তখন তাদেরই দখলে। তবে দাপট অবশ্য আইয়ুর মোনেম খার আশির্বাদ পুষ্ঠ এন এস এফ এর ই বেশি। ছাত্র ইউনিয়ন তখন বিশ্ব বাম রাজনীতির দাবার ছকের কারনে দু'ভাগে বিভক্ত। চীন ও রাশিয়া পন্থী। চীন পন্থীরাই তখন হল সংসদে ক্ষমতাসীন। ছাত্রলীগের অবস্থা খুবই দুর্বল। সীট পেতে ছাত্রলীগ আমার কোন সহায়তাই করতে পারবে না। অবশ্যই মাস চারেকের মধ্যে আমার স্বাভাবিক ভাবেই একটা সীট হয়তো হয়ে যাবে । কিন্তু এতোদিন থাকবো কেথায়? অবশেষে গতি একটা হলো। আমার এক সম্পর্কে মামাতো ভাই এন এস এফের কল্যান একটা রুম পেয়েছে। ওর সাথেই ডাবলিং এর ব্যবস্থা হলো ।

একদিন আপার বাসায় থেকে বিদায় নিয়ে হলে উঠলাম। কিন্তু এখানে ও দেখি অনেক নিয়ম কানুন। একেতো ইংলিশ ডিপামেন্টের নিয়ম কানুন-হাফ শার্ট পড়া যাবে না, স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ক্লাশে যাওয়া যাবে না। ফুল শার্টেও হাতা গুটিয়ে রাখা চলবে না ইত্যাদি। এখন আবার হলে ও নিয়ম কানুন। জোরে কথা বলা চলবে না। বিশেষ করে সিনিয়রদেও রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে ডাইনিংর রুমে যাওয়া চলবে না। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া চলবে না। বাগানের ফুল ছেঁড়া যাবে না। ক্যান্টিনে ও সকালে নাশতা খেতে যাওয়ার সময় সঠিক পোশাকে যেতে হবে। নম্র ভদ্র ভাবে চলতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে হলে ডাবলিং করলে ও অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ দেখে খুবই ভাল লাগলো বিরাট বিরাট দুটি বাগান। অজস্র ফুলে ভরা, দু'জন মালী প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করছে। বাগান দুটি হলকে দুভাগে বিভক্ত করেছে ইস্ট হাউস আর ওয়েস্ট হাউজ। বাগান দুটি অনেকটা ছবিতে দেখা শালিমার গার্ডেনের কথা মনে করিয়ে দিত। আমার মামাতো ভাই ছাড়া অন্য তিন জন রুমমেট ও অত্যন্ত ভালো ও সহানুভূতিশীল ছিল।

আমাদের প্রভোস্ট ছিলেন ড. মফিজ আহম্মেদঅ। রসায়নের অধ্যাপক। আপাদমস্তক ভদ্রলোক। এস এম হলের আরেকটি উল্লেখ্য যোগ্য বৈশিষ্ট ছিল আমাদের দারোয়ান নাজু মিয়া। অবাংগালী সম্ভবত পাঠান। লম্বা ছয় ফুটের উপরে। মাথায় পাগড়ী। পাগড়ী সে নিজেই বানাতো। হলের অনেক সিনিয়র ছাত্রের বিয়ের পাগড়ী ও তার নিজের হাতে বানানো। সজ্জন ব্যক্তি ছিলো এই নাজু মিয়া। স্বাধীনতা পর আর তার দেখা পাই নি। অবশেষে একদিন প্রভোস্ট অফিস থেকে ডাক পড়লো আমার সীট বরাদ্দ হলো এবার আমি নিজের রুমে উঠবো। তিন মাসের ডাবলিং এর অবসান হলো। অবশেষে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত এবং গর্বিত ছাত্র হলাম।

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ ॥
লেখক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সহ সভাপতি (১৯৭০-৭১,৭১-৭২)।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য (১৯৭৪-১৯৮০)।

গবেষণাকথা

চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান

শামসুল আরেফীন

কবিগান একান্তই বাংলার সম্পদ। জর্জ টমসনের গধথীরংস ধহফ ঢ়ড়বঃু গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, সোভিয়েত কাজাখদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান আছে। একে বলা হয় Minstrels' Contest। গ্রন্থটিতে এ-গান ও গায়কদের সম্পর্কে বলা হয়: They Sang extempore. Each of them after listening to a song by another competitor would have to answer him in verse immediately.

বাংলার বাইরে অর্থাৎ বহির্বিশ্বে সম্ভবত এই Minstrels' Contest-এর সাথে কবিগানের কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কবিগান সম্পর্কে লিখেছেন: 'এই গানে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোনো জাতির মধ্যে এরূপ গান দেখা যায় না'।

চট্টগ্রামে কবিগানের প্রচলন কখন্ থেকে জানা যায় নি। কবিগানের উৎপত্তি বা উদ্ভব নিয়ে নানা মত বিদ্যমান। ব্রজসুন্দর সান্যাল 'দমন যাত্রা', ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'যাত্রা', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'ঝুমুর'-এর মধ্যে কবিগানের উৎস খুঁজেছেন। কবিগানের অনেক আগে থেকে প্রচলিত পাঁচালি-র মধ্যেও কবিগানের উৎস অনুসন্ধান করা হয়। এমন অভিমতও রয়েছে যে, সতেরো শতকের শেষে বা আঠারো শতকের প্রারম্ভে কলকাতা শহরে এক নব্য ধনীক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য কবিগানের উৎপত্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত কবিগানের সংকলন 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' গ্রন্থের সমালোচনায় লিখেন: 'বাংলার প্রাচীন কাব্যসহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান' [সাধনা, ১৩০২ বাংলা]। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল তাঁর 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' গ্রন্থে মন্তব্য করেন, পশ্চিমবঙ্গই কবিগানের উৎপত্তি ও বিকাশস্থল। তবে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়াল ও কবিগান গবেষক বিজয় নারায়ণ আচার্য আষাঢ় ১৩২৩ বাংলার 'সৌরভ' পত্রিকায় 'অনেকের অনুমান' ব্যক্ত করেন, কবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান রচনার কিছুকাল আগে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিগানের প্রচলন হয়। বিভিন্ন সূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়, নারায়ণ দেব ষোলো শতকে জীবিত ছিলেন। এ-থেকে বলা যায়, সম্ভবত পূর্ববঙ্গেই সর্বপ্রথম কবিগানের উৎপত্তি হয়। ধারণাযোগ্য, পূর্ববঙ্গে কবিগানের উৎপত্তিকাল থেকে চট্টগ্রামে কবিগানের প্রচলন।

দুই.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়, ড. সুশীল কুমার দে, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও আরও অনেকের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের ইতিহাস মোটামুটি পাওয়া গেলেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কবিগানের ইতিবৃত্ত ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। ফলে এ-সময়কাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের কবিগান সম্পর্কেও জানার সুযোগ অল্প।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকে চট্টগ্রামে কবিগানের জোয়ার ছিল। উক্ত দ্বিতীয়ার্ধে এখানে প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– অপর্ণাচরণ জলদাস, দুর্গাচরণ জলদাস, প্রাণকৃষ্ণ জলদাস, আজগর আলী, নবীন ঠাকুর, মোহনবাঁশী, চিন্তাহরণ, গঙ্গাচরণ জলদাস, হরকুমার শীল, অন্নদা ভট্ট ও সুবল ভট্ট প্রমুখ। আজগর আলীকে চট্টগ্রামের সবচে' প্রাচীন কবিয়াল বলা হয়। তিনি সন্দ্বীপের লোক ছিলেন, থাকতেন সাতকানিয়ার খাগরিয়ায়। এই কবিয়ালরা কবিগান পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কবিগান পরিবেশিত হতো নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে। আসরে দু'টি দল আসতো। দু'দলের নেতৃত্বে থাকতেন দু'জন কবিয়াল বা সরকার। আসরে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে একদল সম্পর্কে অন্য দলের কোন কিছু জানার সুযোগ থাকতো না। আসরে কবিয়াল ছাড়া আসা উভয় দলের আদ্যাশক্তির বন্দনামূলক ডাকসুর ও মালসী গাওয়া সমাপ্ত হলে, একদল এসে সখী-সংবাদের 'দূতী সংবাদ', 'মাথুর' অথবা 'মান'–এ ধরনের কোন চাপান দিত। তখন অপর দলের কবিয়াল তাঁর দলকে জবাব (উতোর) হিসেবে একটি গান বেঁধে দিলে সেই দল গানটি পরিবেশন করে অন্য দলের উদ্দেশ্যে দিত আরেকটি গানের চাপান। মূল কবিয়াল বা সরকার আসরে উঠতেন প্রথম চাপানের পর। চাপান ও উতোর এগিয়ে চলত। অবশেষে 'যোটক' গানের মাধ্যমে কবিগানের সমাপ্তি ঘটতো। কবিয়ালদ্বয়ের কেউ কারও কাছে হার মানতে না চাইলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে উভয়কে বিজয়ী ঘোষণা করে কবিগানের সমাপ্তি টানা হতো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমে কবিগান হতো পৌরাণীক বিষয়-আশয়ে। সাথে থাকতো খিস্তি, খেউড়, বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা। বস্তুত উভয় বঙ্গে উদ্ভবকাল থেকে এভাবেই কবিগানের যাত্রা। ঢাকা-নরসিংদির হরিচরণ আচার্য (১৮৬১-১৯৪১), যিনি উনিশ শতকের শেষে কবিয়াল হিসেবে খ্যাতনামা হয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধেও কবিগান করেন, কবিগানকে মার্জিত ও সুন্দর করণে, তাতে শালীনতা আনয়ন ও উপস্থাপনা রীতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। চট্টগ্রামের কবিগানে এই ভূমিকা রাখেন কবিয়াল করিম বখশ (১৮৭৯-১৯৩৮)। তিনি কবিয়াল আজগর আলীর শিষ্য ও চট্টগ্রামের কবিগানের দ্বার উন্মোচক চিহ্নিত। জানা যায়, তিনি নিরক্ষর হলেও পৌরাণীক বিষয়-আশয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে অপরাজেয় কবিয়ালও বলা হয়। যেহেতু তাঁর সাথে কবির লড়াই করে কেউ কোনদিন জিততে পারেন নি। তিনি হরিচরণ আচার্যের উত্তরসূরি হয়ে চট্টগ্রামের কবিগানে অঞ্চলপ্রীতির স্থলে স্বদেশপ্রীতি আনতেও ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ বাহুল্য, হরিচরণ আচার্যের কালেই কবিগানে প্রথম অঞ্চলপ্রীতির স্থান দখল করে স্বদেশপ্রীতি।

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার বৈলতলী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী করিম বখশের পরে কবিগানের জগতে আবির্ভূত হন রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)। তিনি কবিয়াল নবীন ঠাকুরের শিষ্য। ১৮৯৮ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি কবিয়াল মোহনবাঁশীর সাথে প্রথম কবিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অনেককাল কবিগানের জগতে থেকে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। বলেছি, উভয় বঙ্গে উদ্ভবকাল থেকে পৌরাণীক বিষয়-আশয় নিয়ে কবিগানের যাত্রা। বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্যন্ত চট্টগ্রামে এই বিষয়-আশয়েই কবিগান চলেছে। করিম বখশ চট্টগ্রামের কবিগানে শালীনতা আনয়নে ভূমিকা রাখলেও তিরিশ দশক পর্যন্ত তাতে কিছু না কিছু খিস্তি, খেউড় ছিল। রমেশ শীল নিজেও এসময়ের মধ্যে রেলওয়ে ধর্মঘট, খেলাফৎ আন্দোলন ও সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার অপারেশন দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও করিম বখশের সাথে কবিগান করতে গিয়ে তাঁকে গালি দিয়েছেন। চট্টগ্রাম শহরে আবদুল হক দোভাষীর বাড়িতে কবিগানের আসর বসলে এক পক্ষে ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের রমেশ শীল-হরকুমার শীল ও নোয়াখালী-ফরিদপুর অঞ্চলের চারজন নামকরা কবিয়াল, অন্যপক্ষে ছিলেন করিম বখশ। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে রমেশ শীল ও হরকুমার শীল 'গোয়ালটুরী গাই' (গাভী) সম্বোধন করে করিম বখশকে বিশ্রী গালি দিলে, কৃষক পরিবারের সন্তান করিম বখশ ধৈর্য ধরে পরবর্তীতে সিংহের মতো বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে ওই গালির মার্জিত জবাব দেন। তবে এই রমেশ শীলই চল্লিশ দশকে কবিগানকে একেবারে বিকৃত রুচি, অশ্লীলতা ও গালি মুক্ত করে পৌরাণীক ও কাল্পনিক বিশ্ব থেকে মাটিতে নামিয়ে আনেন।

চল্লিশ দশকের শুরুতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন 'দেশের মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রবল হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ-চেতনা, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণি-সচেতনতা, শ্রমিক ধর্মঘট, জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। মধ্যবিত্তের একটি অংশ যেমন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান থেকে জঘন্য গণবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, র‍্যাডিকাল অংশটি তেমনি আরো র‍্যাডিকাল হয়ে শ্রেণিচ্যুত বিপ্লবীর মন্ত্র নিয়েছে, প্রগতিশীল নাগরিক মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক আন্দোলন কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারাকে সমাজ-বিপ্লবের ডাক দিয়েছে। এই জটিল সময়ের সঠিক প্রতিফলনের জন্য কবিগানে নতুন মাত্রা যোগ করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। হরিচরণ যুগে কবিগানের ভাষায় ও উপস্থাপনায় শালীনতা ও সমুন্নতি এসেছিল, অঞ্চল-প্রীতির স্থলে স্বদেশপ্রীতি ও জাত-পাতের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার স্থলে উদার মানবিকতার হাওয়া লেগেছিল। কিন্তু এ-যুগের দাবি আরো অগ্রসরমানতার। স্বদেশ-প্রীতির সঙ্গে চাই আন্তর্জাতিক চেতনা, উদারতার স্থলে চাই সংগ্রামী বাস্তবতা, নিষ্ক্রিয় মানবিকতার বদলে চাই সক্রিয় শ্রেণিচেতনা। যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য চাই শান্তি-আন্দোলনের বিস্তৃতি, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চাই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন। যুগের এই সব দাবি মেনে নিয়েই বাংলাদেশের কবিগানে যুগান্তরের নকীব হয়ে এলেন চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানার গোমদণ্ডী গ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল' [বাংলাদেশের কবিগান/যতীন সরকার]।

চল্লিশ দশকে পৌরাণীক ও কাল্পনিক বিশ্ব থেকে কবিগানকে মাটিতে নামানোর কিংবা কবিগানে নতুন মাত্রা সংযোজন করার ক্ষেত্রে রমেশ শীলের শিষ্য-সহচর ছিলেন ফণী বড়ুয়া, রাই গোপাল দাস, হেদায়েত ইসলাম খান, গোবিন্দ চন্দ্র দে, শৈলেন সেন, তারাচরণ দাস, বরদাচরণ দে, সারদাচরণ বড়ুয়া, রমেশপুত্র যজ্ঞেশ্বর শীল ও বিনয় বাঁশী প্রমুখ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রামে সরকারি হিসাবমতে প্রায় দুই লক্ষ নর-নারী মারা যায়। তখন কবিয়ালদের জীবন-সংকট নিরসনের জন্য তিনি গঠন করেন 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি'। তাঁর উক্ত শিষ্য সহচররাও এ-সংগঠনে জড়িত ছিলেন। তিনি সভাপতি, ফণী বড়ুয়া ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। বস্তুত একদিকে কবিয়ালদের জীবন-সংকট নিরসন, অন্যদিকে কবিগানে উক্ত নতুন মাত্রা সংযোজনের উদ্দেশ্যে 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি' গঠন করে তাঁর শিষ্য-সহচর ও অন্যান্য কবিয়ালদের তিনি সংগঠিত করেন।

উল্লেখ বাহুল্য, চল্লিশ দশকে কবিগানে নতুন মাত্রা সংযোজনে কমিউনিস্ট পার্টি-চট্টগ্রামের নেতা-কর্মীদেরও ভূমিকা ছিল। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে বঙ্কিম সেন চট্টলেশ, গীরিজা শঙ্কর ও কলিম শরাফী প্রমুখের উদ্যোগে চট্টগ্রামের জেএমসেন হলে আয়োজিত হয় 'কবিয়াল সম্মেলন'। এখানে করিম বখশের শিষ্য মনিন্দ্র সরকার ও সিলেটের কবিয়াল ফণীদাস বিএ কবির লড়াই করেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট-কর্মীরা জেলমুক্ত হওয়ার পর চট্টগ্রামের পল্লি অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার তৎপরতা শুরুর পাশাপাশি চট্টগ্রামের কবিয়ালদের সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজও শুরু করেন। কমিউনিস্ট-নেতা বঙ্কিম সেন চট্টলেশ রমেশ শীলকে এ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হন। বঙ্কিম সেনের মাধ্যমে রমেশ শীল কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-র একটি সংখ্যা পাঠ করে জানান: '...দেশের কথা ঠিক এভাবে জানার কখনও সুযোগ হয়নি। নতুনভাবে গান লেখার একটা দারুণ সাড়া পেলাম। ...এতোদিনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারা চাটগাঁয় এবার গান নিয়ে মানুষ জাগাব' [বাংলাদেশের কবিগান/যতীন সরকার]। কমিউনিস্ট-কর্মী সারদাচরণ শীল রমেশ শীলের শিষ্য-সহচর রাই গোপাল দাসকে কৃষক-সমিতির কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে অনুপ্রেরণা জোগান।

সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রমেশ শীল 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি' গঠনের মাধ্যমে ১৯৪৩ সালে উত্তর চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বাগোয়ান এলাকায় জেলা কৃষক সম্মেলনে 'চাষি বনাম মজুতদার' বিষয়ে কবিগান করেন। এখানেই কবিগানে পৌরাণীক-কাল্পনিক-ধর্মীয় বিষয়, যেমন, রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, এজিদ-হোসেন প্রভৃতির স্থান অধিকার করে মাটির বিষয়-আশয়। এখানেই কবিগানে প্রথম মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়, শাসক-শোষক শ্রেণির স্বরূপ উন্মোচিত হতে শুরু করে। এখানেই কবিগান সমাজভাঙার হাতিয়ার হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এখানেই কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় ধনাঢ্য ব্যক্তির স্থান দখল করে সাধারণ মানুষ। এভাবে এখানেই কবিগানে নতুন মাত্রা যোগ ও নবযুগের অভিষেক ঘটে। রমেশ শীল তাঁর শিষ্য-সহচরদের নিয়ে চল্লিশ দশকে, এমনকি এর পরেও এ ধরনের অনেক কবিগান করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী প্রমুখের উদ্যোগে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলন' ১৯৪৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলে, তাতে 'কৃষক বনাম মজুতদার' বিষয়ে কবিগানের আসরও বসে। এক পক্ষে ছিলেন রমেশ শীল। তাঁর সাথে ছিলেন ফণী বড়ুয়া, রাই গোপাল দাস, যজ্ঞেশ্বর শীল, মনোমোহন দাস ও বিনয় বাঁশী জলদাস। অপর পক্ষে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অপরাজেয় কবিয়াল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে সোনার মেডেল বিজয়ী শেখ গোমানী দেওয়ান ও লম্বোধর চক্রবর্তী। রাত এগারটায় শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাত দু'টায় আপোষমূলক যোটক দিয়ে কবিগানের সমাপ্তি টানা হয়। অন্য এক সময় রমেশ শীল 'মজুতদার আর চাষি' বিষয়ে তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়ার সাথে কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ-লড়াই প্রত্যক্ষ করে বলেন: '...রমেশ শীলের এ যেন অন্য চেহারা। ঝোড়ো কাকের মত সাদা চুলগুলো আলুথালু হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। চোখ দু'টো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে। শরীরের রেখায় রেখায় যেন বিজলীর চমক। ...এ এক নতুন ধরনের কবির লড়াই। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গালাগালি নেই...। এরপরে গোটা হলজুড়ে একটি জিজ্ঞাসা গমগম করে উঠে, চাটগাঁর মানুষ মরবে কি?...হঠাৎ বাজনা থেমে যায়। চড়া গলায় শপথের মত হুঙ্কার শোনা যায়, না, মরবে না। হলশুদ্ধ মানুষ ধনুকের ছিলার মত উঠে দাঁড়ায়। না, মরবে না চট্টগ্রামের মানুষ'। রমেশ শীল একবার তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়ার সাথে 'যুদ্ধ বনাম শান্তি' বিষয়েও কবির লড়াই করেন। সুচরিত চৌধুরী তা প্রত্যক্ষ করে বলেন: '... বন্দনার পর রমেশ শীল মামুলী পোষাক, গ্রাম্য তো বটেই, চেহারায় কোন শিল্প-ভঙ্গিমা নেই, সাদা-সধে–অর্কেস্ট্রা নেই, একটি তারের যন্ত্র পর্যন্ত নেই। শুধু ঢোল আর কাঁসি। সুর ছাড়া কী করে গান হয়? কবিগান শুরু হবার পর বুঝেছিলাম–এতে সুর না হলেও চলে, কেননা কথার রসই হলো কবিগানের প্রাণ'। এ লড়াইয়ে রমেশ শীল ছিলেন যুদ্ধের পক্ষে। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের কবিগানের মাধ্যমে কবিগানে নতুন মাত্রা যোগ করে এ-গানের নবযুগ সৃষ্টি করলেও রমেশ শীলকে এ কারণে জেলেও যেতে হয়। পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে তিনি পরাধীনতার বিরুদ্ধে কবিগান করলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে।

তিন.

কবিগানে রমেশ শীলের সময়কালকে যতীন সরকার তাঁর 'বাংলাদেশের কবিগান' গ্রন্থে 'রমেশ যুগ' অভিহিত করেছেন। রমেশ শীলের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়া (১৯১৫-২০০১) ও রাই গোপাল দাস (১৯১৮-১৯৮৭) তাঁর ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কলকাতার ক্যাথেড্রাল রোডের মাঠ, ধর্মতলা, মুহাম্মদ আলী পার্ক, বর্ধমান বঙ্কিম সাহিত্য পরিষদ, পঞ্চমঠ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গীয় স্থানে, এছাড়া শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা কার্জন হল, ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা টিএসসি চত্বর, ঢাকা হল জগন্নাথ কলেজ, বিটিভির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ডক্টর) সম্বর্ধনা সভা, চট্টগ্রাম শহীদ মিনার চত্বর প্রভৃতি জায়গায় রমেশ শীলের মৃত্যুর পরে ফণী বড়ুয়ার পরিবেশিত কবিগান অবিস্মরণীয়।

রাই গোপাল দাস ১৯৭৮ সালে কলকাতার ক্যাথেড্রাল রোডের মাঠে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র' বিষয়ে ফণী বড়ুয়ার সাথে, ১৯৮১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে রণজি-স্টেডিয়ামে যজ্ঞেশ্বর শীলের সাথে কবির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বেশ আলোচিত হন। না বললেই নয়, রমেশ শীলের মৃত্যুর পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শান্তি চৌধুরীর মাধ্যমে 'বাংলার কবিয়াল' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করলে, তাতে শেখ গোমানী দেওয়ান ও তাঁর কয়েক শিষ্যের গানের সাথে ফণী বড়ুয়া ও রাই গোপাল দাসের গানও স্থান পায়। 'কবিগান সমাজভাঙার হাতিয়ার হয়েছে' এই বিষয় ধরে রাখতে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করা হয়। শেখ গোমানী দেওয়ান ও রমেশ শীলের সংক্ষিপ্ত জীবনীও তাতে ধারণ করা হয়।

চার.

রমেশ শীলের নতুন ধারার কবিগান দ্বারা তাঁর শিষ্য না হয়েও তাঁর নবীন সমসাময়িক মনিন্দ্র সরকার (১৯০০-২০০০) ও ইয়াকুব আলী (১৯৩১-১৯৯৫) অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তাঁরাও রমেশ শীলের সমকালে ও পরে এ রকম কবিগান করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ভাষা স্থপতি অধ্যক্ষ আবুল কাসেমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'কঠিন বাংলা ভাষা বনাম সহজ বাংলা ভাষা' শীর্ষক কবির লড়াইয়ে সারাদেশ থেকে আগত প্রায় আড়াইশ কবিয়ালের মধ্যে মনিন্দ্র সরকারের বিজয় লাভ, ফলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ থেকে তাঁর স্বর্ণপদক প্রাপ্তির তথ্য রয়েছে। ইয়াকুব আলী ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাক ভাষা সম্মেলনে উল্লিখিত 'কঠিন বাংলা ভাষা বনাম সহজ বাংলা ভাষা' শীর্ষক কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়ে কবি খান মুহাম্মদ মঈনউদ্দিন থেকে সোনার মেডেল পান, এমন খবর পাওয়া যায়।

পাঁচ.

রমেশ শীলের নতুন ধারার কবিগানের কিছু না কিছু প্রভাব তাঁর সমসাময়িক, নবীন সমসাময়িক ও আরও পরের নিম্নোক্ত চট্টগ্রামী কবিয়ালদের মধ্যে ছিল:

নজু মিয়া, রমনী মোহন দেব সরকার (১৯০৫-১৯৭১), ছাবের সরকার (১৯০৬-?), নিরঞ্জন দাশ (১৯১৩-?), নূর আহমদ সরকার (১৯১৪-১৯৮৫), শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী (১৯১৭-?), আহমদুর রহমান (১৯২৪-), বিভূতী রঞ্জন নাথ (১৯৩৪-), রাখাল মালাকার (১৯৩৫-), মোহাম্মদ সৈয়দ (১৯৩৬-?), রাখাল দাশ (১৯৪১-), মানিক শীল (১৯৪৩-), খুকী রানী শীল, মোহাম্মদ নুরুল হক, জীবন কৃষ্ণ কানুনগো, সারদা শীল, দুদু মিয়া, রমেশচন্দ্র নাথ, দুর্গাকুমার শীল, অবর্ণ শীল, রসিকচন্দ্র নাথ, রাইমোহন বড়ুয়া, মহেন্দ্রলাল দাশ, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কালা-ময়া ফারুকী, এস এম নূর-উল-আলম, কল্পতরু ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোশতাক আহমদ, মাধুরী ভট্টাচার্য,

বাবুল বিশ্বাস, চক্রপাণী ভট্টাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, ডা. এম আর আলী, নিকুঞ্জ সরকার, ইব্রাহিম সরকার, আব্দুল আজিজ, ইলিয়াছ, সুশীল, শিমুল, ব্রজহরি সরকার, অরুণ বড়ুয়া, নূরুল হুদা, ইসমাঈল, সাধন সরকার, অর্জুন সরকার, কালিপদ সরকার, আবুবক্কর, কামিনী মোহন নাথ, নিরঞ্জন সরকার, রাজারাম, কাজল চক্রবর্তী, কামাল উদ্দিন, গোলাম ছোবহান, শিশির নন্দী, অনিল ধর, কৃষ্ট ঠাকুর, জগদীশ চক্রবর্তী, ডা. সুবল সরকার, মিলন সরকার, দিলীপ দাশ, অশ্বিনী দাশ, মধুসূদন নাথ, সুরেশ বড়ুয়া, অনিল সরকার, পরিতোষ বড়ুয়া, শামসুল আলম, হরিপদ দেয়ারী, তরণী সেন দেয়ারী, চপলা ভট্ট, এবিএম ফরিদুজ্জামান, নাদেরুজ্জামান, বিপি ঠাকুর, এজাহার মিঞা, সুরেন্দ্র পুরোহিত, নিবারণ শীল, মফিজুর রহমান, খায়ের আহমদ, হর গোবিন্দ, ননী গোপাল আচার্য, জিয়াউদ্দিন আহমদ, মণীন্দ্র দে, নিত্যানন্দ সরকার, বিনন্দ সাধু, মকবুল সরকার, ফজল আহমদ, শশী সরকার, ডি এল দাস, কানাইলাল শীল, কামিনী মোহন দাশ, ননী গোপাল, সাধন আচার্য, গোবিন্দ সরকার, গনজম আলী, প্রফুল্ল শীল, আলতাফ মিঞা, কামিনী ভেন্ডার, পূর্ণচন্দ্র চাকমা, অজিউল্লাহ, খগেন্দ্রলাল দে, আহমদ মিঞা, সন্ধ্যা ঠাকুর, নিকুঞ্জ শীল, মণিবালা, গৌরচাঁদ, পুলিন বিহারী পাল, টুনু মিঞা সরকার ও আর অনেকে।

রমেশ শীলের মৃত্যুর পরে, বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত ফণী বড়ুয়া, রাই গোপাল দাস, মনিন্দ্র সরকার ও ইয়াকুব আলীর পাশাপাশি এঁরাও রমেশ শীলের নতুন ধারার কবিগান বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কোন-না-কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। আশির দশকের সমাপ্তিলগ্ন থেকে চট্টগ্রামে কবিয়াল-সংখ্যা ও কবিগান পরিবেশনা হ্রাস পেতে থাকে।

শামসুল আরেফীন ॥
লোকসংস্কৃতি গবেষক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা,
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।

একজন প্রবাসীর চোখে বিশ্বদেখা

মো: ফজলুর রহমান

ঢাকা থেকে হঠাৎই লিয়াকত ভাইয়ের ফোন পেলাম। খোঁজখবর- ভালোমন্দ আদান প্রদান হলো। পরক্ষণেই তিনি আমার কাছে আমার কোন ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে একটি লেখা চাইলেন।

হাতে সময়ও আমার বেশি নেই। আমাকে "ভ্রমণ,, নিয়ে লিখতে বলা হয়েছে। কোথায় যে শুরু করি অর কোথায় গিয়ে শেষ করবো, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। গত ৪২টি বছর ধরে জার্মানিতে আছি। প্রবাসী জীবনে আমার অনেক সুযোগ হয়েছে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। আমি বিশ্বের ৩৮টি দেশ ভ্রমণ করেছি। যদি লেখক হতাম, তা হলে আমার ভ্রমণের উপরেই অন্তত ৪০টি বই থাকতো। কিন্ত আমি তো লেখক নই। তাই আমার দীর্ঘদিনের প্রবাসী জীবন থেকে কিছু স্মৃতিচারণ করার চেষ্টা করছি মাত্র।

"ভ্রমন" এমন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা খুব স্বল্প কথায় লিখা সম্ভব নয়। মানুষ তার সভ্যতার ইতিহাসের একেবারেই শুরু থেকে বা তার পূর্ব থেকেই ভ্রমণের সাথে পরিচিত। খাদ্যের অন্যেশনে, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য, অন্যের আবাস-ভূমি দখলের জন্য, ধর্ম প্রচারের জন্য বা জ্ঞান অর্জনের জন্য, ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে মানুষ অতীতে যেমন ভ্রমণ করেছে, আজও করছে। হয়তো, মানুষ তার সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে ভ্রমণ প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন করেছে বা করছে। তা আবার নির্ভর করছে ভ্রমণবিলাসী- ভ্রমণপ্রেমিকের সাধ আর তার সাধ্যের মধ্যে।

ব্যক্তিগত ভাবে, আমার বেলায় ভ্রমণের একেবারেই প্রথম দিকের কারণ আর বর্তমান বিলাস ভ্রমণ, বা কিছুটা জ্ঞান অর্জন দু'টিই প্রযোজ্য।

একেবারেই অন্ন্যযোগান আর একটু উন্নত জীবনের সন্ধানে ৪২ বছর পূর্বে পাড়ি দেই জার্মানিতে। বিশ্ব দেখার স্বপ্ন আর স্পৃহা দু'টো আমার জীবনের প্রথম থেকেই ছিল। তাই, সাধ আর সাধ্যের মধ্যে যখনই সমন্বয় ঘটাতে পেরেছি, বেরিয়ে পড়েছি কোন না কোন নতুন জগত আবিষ্কারে। প্রথম দিকে একা একা আর পরে পরিবার পরিজন নিয়ে। অনেক দেখেছি জীবনে। অনেক অজানা তথ্য, মনোমুগ্ধকর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, বিশ্ব সেরা যাদুঘর (মিউ-জিযাম) ইত্যাদি কত কি। এসবের কোন একটি দেখে যতটুকু তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত কয়েকটি বই পড়ে তা জানা সম্ভব নয়। এটাই বোধ হয়, জ্ঞান পিপাসু ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভ্রমণ নিয়ে আমি সব সময়ই যেমন অতি আগ্রহী, তেমনই খুবই কৌতূহলীও বটে। তাই যখনই যেখানে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা সুযোগ এসেছে, সেই যায়গায় পৌঁছনোর পূর্বেই তার ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্হান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করেছি। যার ফলে অনেক সময় ঐ স্থনে পৌঁছনোর পর মনে হতো, আমি যেন সেই জায়গায় পূর্বেও এসেছিলাম।

ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, হাঙেরী কিংবা পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশের যেখানেই গিয়েছি, আমি সে সব দেশের নৈসর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অকল্পনীয় সব ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছি। জানতে চেষ্টা করেছি, সে সব সৃষ্টির পেছনের ইতিহাস। আমার দেখা রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ, লন্ডন ইত্যাদি যে কোন একটি শহরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে গেলেই আমি এই ছোট্ট পরিসরে শেষ করতে পারবো না। ছবিতে দেখে, কিংবা বই পড়ে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, রোমের কলোজিয়ম, ভেনিস শহর বা কলোনের ডোম ক্যাথার্ড্রাল সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে। কিন্ত আইফেল টাওয়ারের নীঁচে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার অনুভূতি আর উপভোগের সাধটাই আলাদা। যা লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা জ্ঞান আমার নেই। এসব স্হাপনা নিয়ে পাঠক সমাজকে খুব বেশি কিছু বলার নেই, কারণ, সে সব মোটামোটি সবারই জানা।

আমি আমার এই লিখায় কেবলমাত্র আমার প্রবাসী জীবনের আবাসভূমি আমার দেখা জার্মানি সম্পর্কে কিছু লিখে যবনিকা টানতে চেষ্টা করছি। আমার প্রবাস জীবন শুরু হয় জার্মানির কলোন শহরে। কলোন জার্মানির প্রাচীনতম তিন/চারটি শহরের এক অন্যতম ঐতিহাসিক শহর। এই এলাকাতে আদিম যুগ থেকেই মানুষের যে আবাস ভূমি ছিল, তার বহু নিদর্শন রয়েছে। এ সবের কিছু কিছু এক লক্ষ বছর পুরনো। তার মধ্যে খৃষ্ট- পূর্ব ৫৩০০ বছরের পুরাতন প্রত্নতাত্বিক অনেক মূল্যবান দর্শনীয় বস্ডু বিভিন্ন মিউজিয়াম গুলোতে দেখা যায়। একেবারে মধ্যযুগের মানব সভ্যতার সময় থেকেই কলোন একটি বানিজ্যিক শহরের সুনাম অর্জন করেছিল। আর তাই তো ঐতিহাসিক যে সব কারণে এক শক্তিধর যোদ্ধা আর এক দুর্বলকে পরাজিত করে, দখল করে নিত দুর্বলের আবাসভূমি। কলোনও সেই সব অনেক ইতিহাসের সাক্ষী।

৫০ খৃষ্টাব্দে রোমান মহারাজা ক্লাউডিউস দখল করে কলোন, নাম রেখেছিল "কলোনিয়া"। দুই হাজার বছর পুরাতন এই শহরের অলিতে গলিতে আজও শক্তিধর রোমান সাম্রাজ্যের অসংখ্য ঐতিহাসিক নান্দনিক স্থাপনা, ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণের উৎস।

সে সময়ের রাজতন্ত্রের মধ্যদিয়ে কলোনে খৃষ্টান ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তি সময়ে, অনেক ক্ষমতাধর পাদ্রিদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল এই কলোন। আর এখনও শহরটি ক্যাথলিক খৃষ্টানদের অনেকটা তীর্থভূমি বটে। কলোনের সেই ঐতিহাসিক বিশ্ব বিখ্যাত স্হাপনা কলোন ডোম (ক্যাথার্ড্রাল) সম্পর্কে সবারই জানা। আজও লক্ষ লক্ষ ভ্রমণ পিপাসুদের এক আকর্ষণের যায়গা। গথিক স্টাইল আর্কিটেক্চারের এই স্হাপনটি, ১৫ই আগষ্ট ১২৪৮ সালে শুরু করা হলেও, এর চুড়ান্ত কাজ সম্পন্ন করতে ৬৩২ সাল সময় লেগেছিল। ১৮৮০ সালের ১৫ই অক্টোবর এক অনাড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এর উদ্বোধন করা হয।

এ ভাবে শত শত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিরল সব ঐতিহাসিক স্হাপনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জার্মানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এসবের বর্ণনা দিয়ে লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্ত হাতে একেবারেই সময় নেই । জার্মানির পূর্ব থেকে পশ্চিম, আর উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রায় সবগুলো উল্লেখযোগ্য যায়গায় আমি ঘুরেছি। কাজে অকাজে যখনই যেখানে গিয়েছি, প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক দর্শনীয় কোন স্হান ভ্রমণ করেছি। ঐতিহাসিক ভাবে বিভিন্ন কারণে জার্মানির ইতিহাস যেমন সমৃদ্ধ, ভৌগলিক অবস্থানের কারণেও জার্মানি এক অপূর্ব সুন্দর দেশ। একদিকে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের পাশ ঘেসে গড়ে উঠা শহর গুলো; কিল, এমডেন, ব্রিমেন, হামবুর্গ ও লুভেক ইত্যাদি সামুদ্রিক বন্দর, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাজানো শহরগুলো রয়েছে, তেমনি আবার অন্যদিকে আলপেন পর্বত ঘেসে রয়েছে অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ শহর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুপরিচিত মিউনিক শহর। তাছাড়া, রাজধানী বার্লিন, পুরনো রাজধানী বন, ফ্রাংফুর্ট, স্টুর্টগার্ট, হানোভার, ডোসেলডর্ফ ইত্যাদি প্রতিটি শহরের রয়েছে অগণিত ঐতিহাসিক বিষয়, যা নিয়ে এই জাতি অনেক গর্ব করতে পারে।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলার এরা সময়টুকু যদি ব্রেকেটে বন্ধ রাখি, (যদিও তা নিয়ে অনেক আলোচনা থেকেই যায়) তা হলে দেখা যাবে বিশ্ব সাহিত্য- সাংস্কৃতিতে, কিংবা বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জার্মানদের অবদান অতুলনীয়, অসামান্য। বাখ, মজার্ট, সোমান, হাইনেমান, গ্যোথে (গ্যাটে), ব্রেস্ট, কার্লমাক্স, এংগেল, আইনস্টাইন, ডিজেল ইত্যাদি অগণিত মহামনবদের জন্মস্হান জার্মানির এসব শহরগুলোতে। এদের প্রত্যেকের জন্ম- বাড়িতে রয়েছে এক একটি ঐতিহ্যবাহী যাদুঘর (মিউজিয়াম)। আমার সৌভাগ্য, আমি গর্ব বোধ করি, আমি এই সবক'টি মিউজিয়াম পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। আজ থেকে পঁচিশ- ত্রিশ বছর পূর্বে, আমি বাংলাদেশের অনেকে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের এক ধরনের টুর গাইড হিসেবে নিজের গাড়ীতে করে জার্মানির বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখিয়েছি।

আমার জীবনে বাংলাদেশের অনেক বড়মাপের কিছু মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি। জার্মানিতে বিভিন্ন ভাবে তাঁদের সফর সঙ্গী হতে পেরে নিজে ধন্য হয়েছি। পেয়েছি তাঁদের অনেক স্নেহাদর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। আবার অনেকেই এখনও আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহিত্য- সংস্কৃতি অঙ্গন বলি, আর জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা বলি, অনেকেকেই আমার সাধ্যমত সেবা দিতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের কয়েকজনের সাথে আমার ভ্রমণের কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রয়াত বড় ভাই সমতুল্য ডঃ মিজানুর রহমান শেলী। শেলী ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম কার্লমাক্স এর জন্মস্হান, জার্মানির প্রাচীনতম আর একটি শহর টিয়ার দেখতে। কলোন থেকে রাইন নদীর তীর ঘেসে আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমাদের টিয়ার যাত্রার স্মৃতি আজও চোখের সামনেই ভাসে। নদীর দু'পাশ ঘেসে আঙুর আর আপেল বাগান। কী অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপাটি সাজানোর উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো। মাঝখানে বয়ে চলেছে রাইন আর মাঈন নদী। সাথে ছিল, শেলী ভাইয়ের অসাধারণ জ্ঞান- সমৃদ্ধ গল্প আর জোকস।

কার্লমাক্স এর বাড়ীতে এর আগেও একবার গিয়েছিলাম আমার সমন্ধি, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বরেণ্য কবি আসাদ চৌধুরীকে নিয়ে। ঐতিহাসিক এই শহর দিয়েই রোমান সাম্রাজ্যবাদ সর্বপ্রথম জার্মানিতে ঢুকেছিল। শহরে ঢোকার মুখেই তৈরি করেছিল, কালো পাথরের তৈরি এক বিশাল তোরণ (গেট বা দ্বার) "পর্থা দ' নিগ্রা" প্রবেশদ্বার। জার্মানির প্রাচীনতম এই শহরেই সম্ভবত প্রথম ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ক্যাথার্ড্রাল অবস্থিত।

আসাদ ভাইকে নিয়ে এঙেলস এর জন্মস্হান ভুপার্টাল শহরেও গিয়েছিলাম। অবাক হয়েছিলাম, কার্লমাক্স আর এঙেলস এর পারিবারিক অবস্থানের কথা জেনে। একজন তৎকালীন সময়ের সুপ্রতিষ্টিত শিল্পপতি পরিবারে জন্ম নেয়া, আর অন্যজন স্বনামধন্য আইনজীবী ধনাঢ্য পরিবার থেকে আসা। তাঁরা দু'জন মিলে লিখলেন "ডাস ক্যাপিটাল"। দিলেন সমাজতান্ত্রিক নীতির এক অভিনব দর্শন। সে যাক, আমি কোন রাজনৈতিক আলোচনায় যেতে চাই না। ভুপার্টাল শহরে রয়েছে পৃথিবীর সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো ও দীর্ঘতম ঝুলন্ত ট্রেন। এক অদ্ভুত ধরণের ট্রেন পুরো শহর জুড়ে ছোট্ট এক নদী বা খালের উপর বহে চলেছে সেই শহরের সকল সাধারণ যাত্রীদের। এ ভাবে, বরেণ্য কলামিস্ট, একুশে গানের রচোয়িতা জীবন্ত কিংবদন্তী আমার আত্মীয় পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর নূরুল হুদা ভাই (প্রয়াত) সহ অনেক গুনীজনদের নিয়ে ঘুরেছি জার্মানির অনেক শহরে।

তাঁদের মধ্যে আরও দু'জনের কথা না বললে আমার গল্পের এই অংশটুকু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একজন আহমদ ছফা। প্রয়াত ছফা ভাই যে কী অসাধারণ, কত বড়মাপের একজন চিন্তাবিদ- দার্শনিক ছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে অনেকেই চিনতে পারেননি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার। ফাউস্ট অনুবাদের পূর্বে তিনি সর্বসাকুল্যে প্রায় তিন মাসের মত আমার কাছে ছিলেন।

আমি তাঁর গভীর জ্ঞানের ভান্ডারে মাঝে মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করতাম। তখন আমার বয়স আর অভিজ্ঞতার অপূর্ণতার জন্য তাঁর অনেক তাত্বিক বিশ্লেষণ বুঝতে পারতাম না। তাঁর অনেক আলোচনা, ভবিষ্যতের বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছু বক্তব্য এখন তাঁর অবর্তমানে বাস্ড়বে রূপ নিয়েছে। ফাউস্ট অনুবাদের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, গবেষণা পড়াশোনা দেখে আমি অবাক হতাম। গ্যোথে (গ্যাটে) এর যত জায়গায় বিচরণ ছিল, তার অনেক যায়গা পরিদর্শনে আমি তাঁর সফর সঙ্গী হয়েছি।

আর একজন জীবন্ত কিংবদন্তী, আমার জীবনের অনেক বড় পাওয়া আশীর্বাদ, BPATC সাবেক রেকটর, সাবেক সচিব জনাব আহবাব আহমাদ। আমার সাথে এখনও যাঁর অবিচ্ছেদ্য এক আত্মার সম্পর্ক। তিনি যখন ইকোমিক মিনিস্টার হয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস বন- জার্মানীতে আসলেন, তার কিছুদিন পর থেকেই তাঁর সাথে আমার এক ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সম্পর্ক এখন রক্ত সম্পর্কের অনেক উর্ধে। আহবাব ভাইকে নিয়ে আমার জার্মান প্রবাস জীবনের গল্প লিখে শেষ করা যাবে না। বন, কলোন, বার্লিন, ফ্রাংফুর্ট আউগবুর্গ এবং মিউনিক কত স্মৃতিবিজড়িত ভ্রমণ কাহিনী---। আমি আর পাঠক সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

আমার ভ্রমণ কাহিনীর সর্বশেষ অংশ হলো, আমার বর্তমান আবাস স্হান আউগবুর্গ শহর। জার্মান প্রবাসী জীবন কলোন থেকে শুভ সূচনা হলেও আমি গত ২৮ বছর ধরে আউগবুর্গ শহরে আছি। আউগবুর্গ জার্মানির ব্যাভারিয়ান প্রদেশের একটি জেলা শোয়াভেন এর রাজধানী শহর। বর্তমান জার্মানির ১৬টি প্রদেশের মধ্যে ব্যাভারিয়া প্রদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের শীর্ষস্হানে রয়েছে।

কলোনের মত আউগবুর্গেরও অনেক ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক ইতিহাস আছে। একটি সুপরিচিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ শহর হিসেবে আউগবুর্গ প্রাচীনতম শহর গুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আউগবুর্গ ২০৪১ বছর পুরাতন শহর। বলা হয়ে থাকে টিয়ার এর পরেই এবং কলোনের পূর্বেই দ্বিতীয় শহর হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যবাদ আউগবুর্গ দখল করে। শহর জড়ে রয়েছে রোমান সাম্রাজ্যের অসংখ্য স্হাপনা। ছোট বড় ৫১টি মিউজিয়ামে তুলে ধরা হয়েছে আউগবুর্গের বিচিত্র ধরনের ইতিহাস। এই শহরটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। শহরটি তিনটি নামে পরিচিত; আউগবুর্গ, ফ্রিডেন স্টাট

(Fireden Stadt, ev Peace city) এবং ফুগার স্টাট। স্টাট মানে শহর। আউগবুর্গে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবার থাকতেন। যাদের সাথে তৎকালীন অনেক রাজপরিবারের সাথে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ীক সম্পর্ক ছিল। বংশানুক্রমে তারা এখনও আছেন এবং ফুগা ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ফুগা ফাউন্ডেশনের কর্মযজ্ঞ তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

তাদের মধ্যে ইয়াকুব ও আন্তন ফুগা এর নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারটি আউগবুর্গে অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

সে জন্যই এই শহরকে "ঋঁমমবৎ ঝঃধফঃ" বা ফুগা শহর বলা হয়। তাঁদের অনেক মূল্যবান কর্মযজ্ঞের মধ্যে" ঋঁমমবৎবর" ফুগারাই এক ধরণের সামাজিক আবাসন, যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। ইয়াকুব ফুগা, ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই আবাসনটি তৈরী করেছেন। আবাসনটি ছিল তাদের জন্য, যারা ফুগা ইম্পোমিয়ামে চাকুরী করতেন এবং তুলনামূলক ভাবে স্বল্প আয় ছিল। এক বিশাল এলাকা জড়ে ৬৭টি বিল্ডিং এ ১৪২ জন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল কর্মচারী ও কর্মকর্তারা থাকতেন। তারা সে সময়ের মুদ্রা "বাটছেন" এর এ পয়সা দিয়ে তাদের বাৎসরিক ঘরভাড়া পরিশোধ করতেন। যা আজও বিদ্যমান এবং এখনও বছরে মাত্র ০,৮৮ ইউরো বাৎসরিক ভাড়া দিয়ে লোকজন থাকছেন। আগের মত এখনও ফাউন্ডেশনের কতগুলো রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। ৫০০ শত বছর পূর্বে মানুষের সামাজিক আবাসনের কথা চিন্তা করে তৈরী ফুগারাই বিশ্বজুড়ে এক অনন্য সৃষ্টি এবং একমাত্র উদাহরণ। যা দেখার জন্য এখনও প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভ্রমণ পিপাসুদের ভিড় জমে আউগবুর্গে। ইয়াকুব ফুগার ভাতুস-পুত্র আন্তন ফুগা পরবর্তী সময়ে এই ফাউন্ডেশনের আরও বহুমাত্রিক উন্নয়ন সাধন করে গিয়েছেন। বিনা খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা, হসপিটালসহ অসাধারণ কিছু কাজ, যা থেকে মানুষ যুগ যুগ ধরে উপকৃত হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্ব প্রথম চেক্ দিয়ে লেনদেন তাঁরই সৃষ্টি। বৃহত্তর আউগবুর্গে ১৩০০ থেকে ১৮০০ শতাব্দীর দুই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবার; "ফুগা আর ভেলজা" দের অসংখ্য ঐতিহাসিক কৃতকর্ম আজও বিশ্বের ভ্রমণ প্রেমিকদের অবাক করে।

আমি বলেছিলাম; আউগবুর্গের আর একটি নাম "শান্তির শহর" (Peace City). মার্টিন লুথা এর প্রটেষ্টান খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের ইতিহাস মোটামোটি সবারই জানা আছে। একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ও পাদ্রি হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যের ক্যাথলিক ধর্ম যাজক পরিচালিত শাসনামলে, ১৫০৭ সালে তাঁকে পাদ্রি নির্বাচন দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি ক্যাথলিক চার্চের আচার আচরণের অভিযোগ ও প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। ১৫১৭ সালে তিনি বর্তমান প্রটেস্টান ধর্মের ৯৫টি থিসিস লিখে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তখন তাঁর জীবনে বড় ধরনের আঘাত ও হুমকি আসে। তিনি আউগবুর্গের আন্না চার্চে থেকে গোপনে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই চার্চটি আউগবুর্গের শহরের প্রাণকেন্দ্রে এখনও বিদ্যমান।

শুরু হয়ে যায় বিশ্বের সর্বকালের সর্ববৃহৎ ধর্ম যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইউরোপসহ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিশ্বজুড়ে। ত্রিশ বছরে, প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন মানুষের জীবনের বিনিময়ে আসে এক সমঝোতা- শান্তির প্রস্ড়াব। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বিরতি হলেও ৮ই আগষ্ট ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আউগবুর্গেই আবার দুই মতাদর্শের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে চুড়ান্ত শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হয়। সে থেকেই এই দিনটিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ সালে এসে দিনটিকে আউগবুর্গের সরকারি ছুটির দিন ধার্য করা হয়। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকেই আউগবুর্গের আর এক নাম শান্তির শহর।

আমার লিখা সম্ভবত নিজের অজান্তেই অনেক বড় হয়ে গেল। এত তথ্যভান্ডার, কি করে সংক্ষিপ্ত করে লিখতে হয়, তাও জানি না। আর কয়েকটি কথা লিখেই আমার ভ্রমণ কাহিনী শেষ করার চেষ্টা করবো। ভ্রমণ মানুষের চাহিদার এক অন্যতম সহজাত চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীতে যেমন মানুষ বিভিন্ন কারণে ভ্রমণ করেছে, বর্তমানেও তা করছে। আর ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরে তা করে যাবে। একটি দেশ, একটি জাতি, একটি সমাজ কতটা যে উন্নত ও সমৃদ্ধ, তা আমরা তাদের ঐতিহাসিক নান্দনিক কর্মযজ্ঞের নিদর্শন থেকে জানতে পারি।

যে দেশ যত বেশী তার কৃষ্টি- সংস্কৃতির ধারক বাহক সে দেশ ততবেশী সমৃদ্ধ ও উন্নত। যে জাতি তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায়- অন্যায়ের, ভালোমন্দের সকল ইতিহাস সযতনে সংরক্ষণ করতে পেরেছে, সে জাতি, সে দেশ ততটাই উন্নয়ন-নর শিখরে উঠেছে। ইতিহাসের কোন অংশ বাদ দিয়ে কোন ইতিহাস সম্পূর্নতা পায়না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে এটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এর জলন্ত এক উদাহরণ; আমার বাড়ীর ২৫ কি: মি: দূরে অবস্থিত হিটলারের অনেক অমানবিক কর্মশালার একটি, "ডাকাও কনসেট্রেশন ক্যাম্প"। মানুষ মানুষের উপর অমানবিক পাশবিক অত্যাচারের এক জলন্ত দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছে এই ক্যাম্পে। বহুবার একা একা, আবার কখনও কোন স্বনামধন্য অতীতিদের নিয়ে ঘুরে দেখেছি এই যঘন্যতর অত্যাচারের কারখানাটি। অনেকেই দেখেছি একঘন্টার মধেই দেখা শেষ করে বের হয়ে যায়। আমি সেখান থেকে পাঁচ ঘন্টায়ও বের হতে পারি নাই। সেখানে গলে মনে পড়ে যায় বাঙালিদের উপর পাকিস্ড়ানী হানাদার বাহিনীর পাশবিক অমানবিক নির্যাতন আর অত্যাচারের কথা। ষোল বছরের কৈশোর জীবনে নিজের চোখে দেখা কত অশূর- প্রকৃতির অত্যাচার। হিটলার কর্মকান্ড ও এ জাতীয় অসংখ্য নিদর্শনের কোন অংশ বাদ না দিয়ে সযতনে তার সংরক্ষণের জন্য জার্মান জাতিকে আমার স্বশ্রদ্ধ কুর্নিশ। ফিরে আসি আমাদের দেশে। ঐতিহাসিক ভাবে আমরা বড় বড় কথার বাহাদুর ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই আমাদের নেই।

উপমহাদেশে সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই যে সব ঐতিহাসিক নান্দনিক দেখার মত যা কিছুই আছে, তা সবটুকুই আজকের ভারতের কাছে। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। অশোক, গুপ্ত বা পাল ডোনাস্টির যতসব কৃতকর্ম স্হাপনা সবকিছুই ভারতে। পরর্তিতে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের যতসব উন্নয়ন আর দর্শনীয় উল্লেখযোগ্য সুপরিচিত সবকিছুই রয়েছে আজকের ভারতে।

এক কথায় বংগদেশে কখনো কোন রাজা বাদশাহদের আবির্ভাব ঘটেনি। যে ক'টি স্হাপনা বৃটিশ আমল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, তা কোন ছোট খাটো জমিদারদের আবাসন। রাজার প্রতিনিধি সুবেদার শায়েস্ড়া খাঁ এর লালবাগ কেল্লা বা আহসান মন্জিল ইত্যাদি নিয়ে আমাদের গর্বের যায়গা সীমাবদ্ধ। তাও আবার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে, টুরিস্ট আকর্ষণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। সোনার গাঁ, কিংবা নাটোরে রাণী ভবানী প্রাসাদ ইত্যাদি সংরক্ষণের অভাবে তিলে তিলে শেষ হতে চলেছে। ঐতিহ্য বাহী মহাস্হান গঢ় ইত্যাদি নিয়েও নেই সরকারী তেমন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ আর প্রচারণা।

বাংলাদেশ তার যে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল, তা দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি প্রেমিক ভ্রমণ পিপাসুদের অনেকটা চাহিদা মেটাতে পারতো। কিন্ত সেখানেও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত নয়।
পৃথিবীর বহু দেশ আছে, কেবল তার টুরিস্ট খাতের আয়ের উৎস থেকে উন্নয়নের শিখরে চলে গেছে। সব শেষে, বৈশ্বিক করোনা কালীন দুঃসময়ে সকলের জন্য আন্তরিক শুভকামনা। ভ্রমণ হোক মানব সভ্যতার বিকাশের উৎস।

লেখক ॥
মো. ফজলুর রহমান ॥
জার্মান প্রবাসী ভ্রমন লেখক ।

ধূসর রাত আর উজ্জ্বল দিন

ইউসুফ শরীফ

টেবিলে নয় পাশে আলাদা সাইড কেবিনেটে থাকবে টেলিফোন– একটা নয় অন্তত তিনটা। টেলিফোন নিয়ে এই ছেলেমানুষি ভাবনা এক সময় পেয়ে বসেছিল তাকে। টেবিলের পাশে ছোট কেবিনেটে তিনটা টেলিফোন– একটা ইন্টারকম-দু'টা ল্যান্ডফোন– এছাড়া আরও দু'টা সেলফোন এখন শাহেদের যন্ত্রণা। কমার্শিয়াল অফিস হলে অংকের নিয়মে কথা বলা যায়। তা তো আর হবার নয়– সকাল থেকেই অনিবার্য এক যন্ত্রণার শুরু। যন্ত্রণায় যখন অতিষ্ঠপ্রায় তখন এল সেই কল যার অপেক্ষায় গত দু'টা বছর গোপন অস্থিরতায় বার বার এলোমেলো হয়ে ওঠেছে।
–হ্যালো– যাচ্ছেন তো কাল–
বুকের গোপন কুঠুরিতে সযত্নে রক্ষিত কণ্ঠ– প্রশ্নটা ঠাহর করতে যা একটু সময় লাগল। যাবার বিষয়টা সবার জানার কথা নয়– যারা জানে ইতোমধ্যে তারা অনেকেই কথা বলেছে। টেলিফোনের ওপারে যে আছে তার পক্ষেও জানা সম্ভব– খুবই সম্ভব।
ফোনের ওপাশ থেকে হালকা রহস্য-মাখা হাসি, কী অসুবিধা আছে বলতে!
শাহেদ সচকিত হয়ে ওঠে, তা কেন! তবে এতদিন পর শার্মিন নার্গিস খান– বিষয়টা হজম করতে–
শার্মিন এবার তার সেই বিশেষ হাসি বিকশিত করল, বাহ এমন করে বলছেন– যেন এই সাতশ' তিরিশটা দিনে আস্ত জীবন পার করে দিয়েছি আমরা।

কণ্ঠে শাহেদও একটু রহস্য মাখাল, একদিন কিংবা তারচেয়েও কম সময়ের জীবনও তো আছে। সন্ধ্যারাতে জীবন শুরু করে রাত পোহাবার আগেই শেষ–

হাসল শার্মিন, রাতের রাণী বলে কথা– হবে না কেন! তার তো আর দিবস রজনী নেই–

শাহেদ বলল, দূরের রাণী বলেও একটা কথা হতে পারে– নাকি?

শার্মিন প্রগলভ, ওহ সিওর– সুদূরিকা নীহারিকা...

ত্বরিৎ জবাব শাহেদের, ওসবও মানুষের চোখ ফাঁকি দিতে পারছে না–

হেসে ফেলল শার্মিন, তাতো পারবেই না। তবে চোখ আর মন– ফারাক অনেক– দূরের পরশে নয়ন তৃপ্ত হলেও হতে পারে– মন কী তাতে–

শাহেদ বলল, আমিও তো বলি– দূরের পরশ– কবিতায় কাজে লাগে– জীবনে কী লাগে–

আবারও হেসে ওঠল শার্মিন, ওরে বাব্বা! সেই সাহিত্য আর দর্শন এক সঙ্গে– পারব না– পারবই না–

শাহেদ সিরিয়াস, সাহিত্য আর দর্শনকেই যদি ভয়– তাহলে চোখের বৃত্তে মনকে টেনে আনা কেন?

গম্ভীর শার্মিন, ভয় আর অভয়ের মধ্যে তফাৎ মাত্র একটা অ–

ব্যাখ্যামুখর শাহেদ, অ-টা কিন্তু শুরু। আমরা পার হয়ে এসেছি অনেক আগেই–

শার্মিন হাসি ছড়াতে ছড়াতে, মগজটা ম্যানেজমেন্টের– হৃদয়টা সাহিত্যের– এ-ও বুঝেছি অনেক আগেই। কাজেই মাফ চাই– বুঝলেন মাফ চাইছি– দয়াকরে আরও একবার মাফ করে দিলে হয় না!

শাহেদ বলল, সবাই মাফ করবেই বা কেন?

কথা খাটো করতে চায় শার্মিন, আগামী এক পক্ষকাল কি মাফ কিংবা শান্তির জন্য কম সময়? কাল ভোরে তাহলে এয়ারপোর্টে–

তবু শাহেদ জিজ্ঞেস করল, যাচ্ছেন তো আপনি?

শার্মিনের কণ্ঠে সেই রিনঝিন হাসি, লেট আস হোপ–

ছেড়ে দিয়েছে শার্মিন। শাহেদের কানে অনুরণিত হচ্ছে : লেট-আস-হোপ-হোপ-হো-প– হোপ মানে কী নিছক শাব্দিক আশা নাকি তারচেয়ে বেশি বস্তুগত কিছু! শার্মিন কি এতদিন পর সত্যিই কোন বার্তা দিল– নাকি রঙিন পাখার সেই বায়বীয় ওড়াওড়ি–

দুই.

কোপেনহেগেনে পনের দিনের প্রোগ্রাম : স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সফল সমবায় উপদেষ্টাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়। দেশওয়ারি পেপার প্রেজেন্টেশনে অংশ নেবে শাহেদ– তার সোসাইটির একটা বড় স্বীকৃতিও। পেপারটায় আবার একটু চোখ বুলাবে। কো-অর্ডিনেটর তাহমিদা সকালেই দিয়ে গেছে প্রিন্ট।

মার্চ মাসের সিডিউলটা দেখেও ও-কে করতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে সবগুলো প্রকল্প এলাকায় বয়স্কশিক্ষার ক্লাস চালু করেছিল– ফলাফল ভাল। আরও দু'মাস চালু রাখতে হবে। শার্মিনের ফোনের আগে এই ফাইলটাই মাত্র সই করতে পেরেছিল– বাকি কাজ পড়ে আছে।

তাগিদ দিতে এল তাহমিদা, শাহেদ ভাই আজ চারটার মধ্যে অফিস ছাড়তে হবে আপনাকে– মনে আছে তো?

শাহেদ হাসল, হবে– হবে। চারটার মধ্যেই শেষ করে ফেলব।

তাহমিদা যেতে যেতে বলল, আপনি কিন্তু কোনদিনই বললেন না ছবিটা কার? অদ্ভুত ছবি– চিত্রকর্ম না ফটোগ্রাফ– বোঝা মুশকিল। কখনও মনে হয় চিনে ফেলেছি– পরক্ষণেই আবার মনে হয়– না মোটেই চিনতে পারিনি– শুধু চমৎকার নয়– আকর্ষণীয় এক রহস্যও!

হেসে ফেলল শাহেদ, তোমার এখন রহস্য ভেদ করতে হবে না। যাও– আগামী মাসের সিডিউলটা শেষ করে আমাকে দেখিয়ে নাও।

শাহেদ ঘুরে বসল। পেছনে কেবিনেটের উপর সেই ছবি : যমুনার বালুচরে মেটে জোছনায় ধূসর শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে– তার ভেতরে ঢাকা পড়েছে দীর্ঘাঙ্গিণী শার্মিন– মুখটা দেখা গেলেও ঘোলাটে ছায়া পড়ায় ঠিক ঠিক চেনা যায় না। ছ' বছর আগে তুলেছিল এই ছবি। যার ছবি তাকে দেয়া হয়নি। ছবির কথা বলেছিল– শুধু হাসি ছাড়া শার্মিন বলেনি আর কিছু–

ছবিটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে– ধরা পড়ছে : যমুনার চর নিশিরাতে আকাশ-বালুকা-পানি মেটে জোছনায় একাকার-ধূসর। তাঁবুর পাশে সেই ধূসরতা সামনে নিয়ে তারা দু'জন। ডগায়-পাতায়-গোছায় ভেজা বালিতে পা যেন গ্রিক প্রত্নসম্পদ। তারপর যমুনার পানি খেয়ালি মেয়ের আঁচল– এলোমেলো ছুঁয়েছেনে যাচ্ছে চরের বালি। শার্মিনের আঙুল সেই পানিতে-বালিতে লিখছে– কি লিখছে জানে শুধু শার্মিন একা আর কেউ নয়– শাহেদও নয়। কারণ তার লেখায় কোন অক্ষর স্পষ্ট হচ্ছে না– মনোচিন্তার অস্পষ্টতাই ধরা পড়ছে মাত্র।

শাহেদ একটু দূরে সরে গিয়ে বালির বিস্তীর্ণ শ্লেটে এক দুই করে লিখল তাদের মিলগুলো :

টাকি ভর্তা, ডিম ভাজি, নিরামিষ, ঝরঝরে খিচুড়ি আর সরিষারতেলে-ধনেপাতায় মাখা মুড়ি সবশেষে চা-চা মানে শুধু চা– দুধ-চিনি ছাড়া কড়া লিকারে। হালকা নীল-বেগুনি আর ধূসর রঙ। মিথ্যার প্রতিবাদ-তৎক্ষণাৎ সত্য উচ্চারণ-ক্ষোভ না পুষে সরাসরি ফয়সালা। কাজের সময় লো ভলিউমে গোলাম আলির কণ্ঠে হসরত মোহানীর গজল– চুপকে চুপকে আঁসু...দিনের বেলা গাড়িতে ঢাকার বাইরে যাবার সময় নজরুল সঙ্গীত– আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ... আর রাতে শোবার আগে রবীন্দ্র সঙ্গীত– লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া...। সিরিয়াস উপন্যাস- উন্নয়ন সংক্রান্ত ও ইতিহাসের নানা জটিল বাঁক নিয়ে রচিত গ্রন্থ। কারও দুঃখে খুশি ও উন্নতিতে নাখোশ কখনও নয়। দরিদ্র অসহায় মানুষই আপন। সমাজতন্ত্র নয়-ব্যর্থ হয়েছে মানুষ। উন্নয়নের উৎস ঋণ নয়-একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া– সমবায়।

লেখা অসম্পূর্ণ রেখেই শাহেদ ডাকল, শার্মিন আমরা কি এখানে একটা স্বাক্ষর করতে পারি না?

উঠে এল শার্মিন। তার দীঘল আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে পানি আর বালির আর্দ্র মমতা। সে আঙুল তুলে তুলে শব্দ করে পড়ল। তারপর চোখ বড় করে তাকাল শাহেদের চোখে–

শাহেদ বলল, এগুলো আমাদের যৌথক্ষেত্রও বলতে পারেন–

চোখ সরিয়ে তাকাল শার্মিন লেখার শুরুর দিকটায়– যমুনার পানি বালি চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনেক দূর স্পর্শ করে আছে। ভেজা বালিতে লেখা যায় কিন্তু সে লেখা থাকে না বেশিক্ষণ।

শার্মিন কণ্ঠে রহস্য মাখিয়ে হাসল, যৌথক্ষেত্র এখনই চুকেবুকে যাবে বালিতে-পানিতে–

শাহেদ বলল, লেখা ঠিকই চুকেবুকে যাবে– যৌথক্ষেত্র নয়। ভাললাগার ক্ষেত্র কখনও ফুরায় না– জানেন তো!

কথা ঘুরাল শার্মিন, জানেন শাহেদ কণিকার একটা নতুন ক্যাসেট এনেছিলাম– এখন আর ব্যাগে খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে লায়লা বলল, ব্যাগে নয় খোঁজ হৃদয়ে– কিছুই হারায় না– সব জমা থাকে হৃদয় নামের যাদুর ব্যাগে– অগণিত পরত-ধারণক্ষমতা অসংখ্য-ওখানে কিছুই নাই আবার সবই আছে– এরই নাম হৃদয়। এবার হৃদয় নামের ব্যাগটায় চোখ রাখ লক্ষ্মী মেয়ে–

শাহেদ একটু চমকায়– ধূসর শাড়িপরা গমরঙ শার্মিন নদী আর জ্যোৎস্নার ধূসরতায় মিলেমিশে স্থির।

লায়লার চোখ পড়ে বালির লেখায়। উপরের দিক মিলিয়ে এসেছে। এখনও ঠিকঠাক আছে : 'উন্নয়নের উৎস ঋণ নয়, একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া– সমবায়।'

লায়লা বলল, তোমরা ভুলে যাও কেন– আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত মিশে আছে আহসান চৌধুরীর লোক? যমুনা চরাঞ্চলের মানুষদের জন্য এই প্রোজেক্ট কত কোটি টাকার আর খরচ হচ্ছে কত– জান? জান না। টাকার অংকের ঘর শূন্য রেখে কেন স্বাক্ষর-টিপছাপ নিচ্ছি আমরা? আমাদের কাছে কোন জবাব নেই– কারও কাছে আছে কী?

শার্মিন কোন কথা না বলে তাকাল লায়লার দিকে। ধূসর আলোয় চোখে তার বিদ্যুৎ চমকাল।

যা বিশ্বাস করি– তা গোপন করব– কার ভয়ে– শার্মিনের কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠ বিস্তীর্ণ চরের বাতাসে প্রবাহিত হতে থাকল– ধূসর ছায়ার দু'বাহুর মাঝ বরাবর বিদ্যুৎলতা ঝলসে ওঠল।

মাগুরা থেকে সাতক্ষীরা ধবল জোছনাপ্লাবিত ভাঙা রাস্তায় তাদের মাইক্রো যেন খেয়াযান– ক্যাসেটে বাজছে– আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ... তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু শার্মিনের টিকালো নাক শাহেদের বুকে কি কথা লিখেছে– দীঘল চুলের অদ্ভুত ভেজা ভেজা ঘ্রাণ কোন ধুপছায়া পথ দেখিয়েছে– সকালের ঝাঁঝালো রোদে সেসব আর মনে করতে পারেনি শাহেদ। তারপরও এ সবই তো বাস্তবতা। পিরোজপুরে সাঁকো পার হতে গিয়ে পা হড়কে শার্মিন অবলীলায় শাহেদকে জাপটে ধরে সাঁকোর বাঁশে ঝুলে স্বচ্ছ পানিতে যুগল ছায়ার ভেঙেপড়া– সটান হয়েওঠার শিহরণ লুকিয়ে ফেলে উদ্বিগ্ন হয়েছে– কখন পৌঁছবে ফেরিঘাটে!

উষ্ণ কোমল শার্মিনের ভার বহনের আকস্মিকতা হৃদয়ে ধারণ করার চেয়ে শাহেদ অধিক সতর্ক পা টিপে টিপে বাঁশের সাঁকো পার হওয়ায়। শার্মিন কতটা কোমল– কতটা পেলব– কখনও ভাবেনি শাহেদ। ভাবলেও সেই ভাবনা কোন-ভাবেই প্রবহমান থাকত না। শার্মিনকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দেয়ার পর তার বুক জুড়ে ঢেউ ওঠল শূন্যতার। স্তিমিত-অস্তিমিতের মাঝখানের হাসি ঝুলিয়ে শার্মিন দাঁড়াল– অনেকক্ষণ চোখ খুলল না– খুলতে পারলই না– সঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গোপন করা যে কী কঠিন টের পেল মর্মে মর্মে। শাহেদ বলল, ওকি শার্মিন চোখ খুলুন– ভয় নেই– বিপদ উতরে গেছে– সাঁকো পার হয়ে এসেছি আমরা– টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি তো নয়– যেন বার্থডে পার্টির নানা রঙের বেলুন– আর সে বেলুন হেসেখেলে কত যে ফুটো করেছে শার্মিন– সে হিসাব রেখেছে শুধু শাহেদ!

সাত বছর– হ্যা সাত বছরই ছিল তারা এক কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি। শার্মিনের প্রান্তর যাকে বলে খোলামেলা– তেমন দেখেনি কখনও। রহস্য আর কৌতূহলে সারাক্ষণ জমকালো শার্মিন। ব্যতিক্রম শুধু ফিল্ড ওয়ার্কে– একদম খোলামে-লা-সাদামাটা অথচ আন্তরিক আচরণে মুহূর্তে টার্গেট গ্রুপের সাথে মিশে যাওয়া– তাদের আপন হয়ে ওঠা– নারী শুধু নয় পুরুষরাও তার সাথে খোলামেলা– সে তাদের আস্থা রক্ষায় প্রাণপাত করতে এক পায়ে খাড়া।

নারীরা-পুরুষ সবাই মেম'পা বলতে অজ্ঞান। গাঁয়ের কোন কোন পুরুষ অনেক সময় গোপন কথাও মেম'পাকে অবলী-লায় বলেছে। শাহেদ বা অন্য কোন পুরুষের সামনে যা বলতে পারেনি তাই বলেছে তাকে দারুণ আস্থায়-নির্ভরতায়। শহরে নিয়ে কাউকে কাউকে দেহজ-দুর্বলতার চিকিৎসাও করিয়েছে। অনেকের পারিবারিক– এমনকি দাম্পত্য ঝগড়া-বিবাদও তার জন্যই মিটেছে। শার্মিনের কথা– সার্বিক সমাধান! এই লক্ষ্যে কাজ করতে কর্মসূচি শেষ করতে ওর সময় একটু বেশি লাগলেও প্রোগ্রাম প্রায় শতভাগ সফল হত।

মাঝেমধ্যে সহকর্মীরা প্রশ্ন করেছে, অত কী কথা বলেন? একটা করতে এসে আরেকটা না করলেই কী নয়?

সাফ জবাব শার্মিনের– না। আঙুলের ডগা দিয়ে পানি ছিটিয়ে ঘর ধোয়া যায় না। আমরা ক্ষুদ্র ঋণ দিচ্ছি– ও দিয়ে ওরা কি করবে? ঋণের ব্যবহারটা কি ওরা জানে– ঋণ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্য মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় আর সেজন্য প্রয়োজন পারিবারিক শান্তি। আর পারিবারিক শান্তির জন্য চারটা ডাল-ভাতের পাশাপাশি তৃপ্ত দাম্পত্য জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কী ঠিক বলিনি!

এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সহকর্মীদের কাউকে পাওয়া যায়নি কখনও। একজন সুন্দরী তরুণী যতই সংস্কারমুক্ত হোক তার সাথে এই বিষয়ে আরও অগ্রসর আলোচনা! না লজ্জার বাধ সহকর্মীরা কেউ কখনও ভাঙতে পারেনি। আড়ালে তারা শাহেদকে বলত, আমরা না হয় সাহস পাই না– তুমি চুপ মেরে থাক কেন– চালিয়ে যেতে পার না!

শাহেদ বলত, শার্মিন নার্গিস খান কি পছন্দ করে আর না করে– ওটা বোঝার বুদ্ধি তোমাদের এখনও পাকেনি। ওর পছন্দ টার্গেট গ্রুপ আর বেটার– বেটার পারফরমেন্স এবং সাকসেসের পর সাকসেস–

পছন্দের দৃঢ়তার কারণেই প্রথম মোকাবিলাটা শার্মিন করে। শাহেদের ছিল নীরব সমর্থন শুধু। ফাইনাল মোকাবিলাটাও শার্মিনই করে। এক বছর ধরে এই মোকাবিলা চলে আহসান চৌধুরীর সঙ্গে। এই সময়টাতে শাহেদের প্রস্তুতিও শেষ হয়। শার্মিন তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি– যোগ দেয়নি শাহেদের প্রস্তুতিতে– তার নিজের মত করে করেছে। দু'জনেরই লক্ষ্য এক আত্ম-উন্নয়নের চাকাটা ঠেলে নেয়ার স্পৃহা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দেয়া এবং বাধাগুলো গোষ্ঠিবদ্ধভাবে মোকাবিলায় উদ্দীপ্ত করা– সেই দশে মিলে করি কাজ– আর কী!

শার্মিন আর শাহেদ এগিয়েছে সমান্তরাল গতিতে– বলা যায় অনেকটাই এগিয়েছে। সেই শার্মিন আজ নিজে ফোন করল। সে কী তার অভ্যাস বদলেছে! শাহেদ জানে বাংলাদেশ থেকে সে একাই যাচ্ছে। এখন জানল তার জানাটা ঠিক নয়– সে একা নয়– শার্মিনও যাচ্ছে। শুধু তাই নয়– শাহেদের যাবার খবরটাও তার জানা। শার্মিনের মাত্রাটা অস্পষ্ট হলেও সে বুঝতে পারছে। ডেনিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রোগ্রামটা ছোট নয়– বলা যায় বেশ বড়ই। এ রকম একটা প্রোগ্রামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে– শাহেদ কিছুটা গর্ব অনুভব করেছিল। দু'বছর আগেও ঘটনা তো এরকমই ঘটেছিল। আহসান চৌধুরীকে নাজেহাল করবে সে– এই সেক্টরে সবাই বাহবা দেবে তাকে। ঘটনা ঘটল অন্য রকম। আচমকা শার্মিন নাজেহাল নয়– একেবারে ধ্বসিয়ে দিল আহসান চৌধুরীকে। তার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেল– বাগাড়ম্বরে-কাগজপত্রে কল্যাণব্রত-প্রকল্পের অর্থ লোপাট-মানুষের দারিদ্রকে পণ্য হিসেবে চড়া দামে বিক্রি এই সবই কমলাপুর রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমের মত খোলামেলা করে দিয়ে শার্মিন বিজয়ী ভঙ্গিতে হাত নাড়াল এই সেক্টরে সবাইকে লক্ষ্য করে। রাতারাতি দুর্দান্ত ইমেজে আর্বিভূত হল শার্মিন নার্গিস খান– বাহবাটা নিয়ে নিল। সংবাদপত্রগুলো মুখিয়ে ছিল। লিখে দিল– কল্যাণকর্মে নারীরাই হতে পারে অগ্রগামী– জনকল্যাণে নারীদের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য...

তিন.

স্ক্রিনে ভেসে ওঠল– কল ফেল।

সহজে বিরক্ত হয় না শাহেদ। সে জানে বিরক্ত হওয়া মানে পিছিয়ে পড়া। কোন কাজে কখনও বিরক্ত হওয়ার আগে অনেকবার ভাবে। আজকে বিরক্ত হল। দু'দুটা মোবাইলে চেষ্টা করেও পারছে না। তারপরও মোবাইল রেখে দিতে পারল না।

আবার কল করল। স্ক্রিনে এবার ভেসে ওঠল– নেটওয়ার্ক ফেল।

রাত বাড়ছে– ভোরে উঠতে হবে। আটটায় ফ্লাইট– সাতটায় পৌঁছতে হলে রওনা দিতে হবে ছ'টায় মধ্যে। শাহেদের মন চাইছিল শার্মিনকে একটা হ্যালো– বলে শুতে যাবে– হল না। মন খারাপ বাতাস চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। মোবাইল বেজে ওঠল তখনই।

ওপাশে সেই পরিচ্ছন্ন রিনঝিন হাসি, ব্যাপার কী কাহার সনে এত কথা– কী কথা তাহার সনে– বারবার শুধু স্ক্রিনে কল ফেল– নেটওয়ার্ক ফেল ঘটনা কি?

হেসে ওঠল শাহেদ, আমারও তো একই কথা– বারবার শুধু স্ক্রিনে কল ফেল– নেটওয়ার্ক ফেল– কাহার সনে এত কথা, কী কথা তাহার সনে–

শার্মিন বলল, তুমি জানতে আমি ফোন করব?

শাহেদ বলল, জানতাম– জানতাম বলেই আগে ফোন করার চেষ্টা করেছি।

শার্মিন বলল, এখন জানলে তো দু'জনে দু'জনকে ট্রাই করলেই কল ফেল করে– নেটওয়ার্কও ফেল করে– একজন আরেকজনকে সময় দিতে হয়–

শাহেদ হেসে ওঠল, তাহলে বোঝ সাত-সাতটি বছর একজনকেই এগিয়ে আসতে হয়–

শার্মিনও হাসল, আরেকজনকেও এটা বুঝতে হয়। এখন ঘুমাও– প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে নাও। সাত সাতটি বছর খুব জ্বালিয়েছ– মনে আছে হে দুষ্টু বালক–

মোবাইল ছেড়ে দিল দু'জনই। তারপরই যমুনার চরে হৃদয় নামক যাদুর ব্যাগের গোপন পরতে তুলে রাখা কামনা জীবনের পলিতে ডালপালা মেলল– শব্দহীন দৃশ্যহীন শূন্যতা এক পলকে ডিঙিয়ে কত সহজ-স্বচ্ছন্দে একে অন্যকে স্পর্শ করল–

এটা আদতেই কোন গল্প নয়–

শার্মিন-শাহেদের গল্পের শুরুটা এখান থেকে হতে পারে। আমরা সবাই জানি– এরপর তাদের কী কঠিন সময়– কী তীব্র বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হবে। তবে দু'জনের হাত গভীর আস্থায় শক্ত করে ধরা থাকবে– এইটুকু ভরসা তারা করতে পারে– পারা উচিত–

ইউসুফ শরীফ ॥

দেশের বরিষ্ঠ কথাশিল্পী, স্বনামধন্য সাংবাদিক

অভয়ারণ্য

রাহমান ওয়াহিদ

'মাথার সামনের দিকে সামান্য চুলটুকুই শুধু নাই,আর সবই তো ঠিক আছে। তাহলে আপত্তি ক্যানো বলতো মা?'

'চুল তো কোন ফ্যাক্টর না মা। অনেক কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফাইনালে উঠেছি। এখন বিয়ে হলে পড়াশোনার কতটা ক্ষতি হবে- ভেবেছ একবারো? পড়াশোনার চাপে তিন বেলা খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাই না। তোমার জামাইবাবুকে সময়টা দেব কখন?'

' কিন্তু জানাশোনার মধ্যে এমন ভালো ছেলে কি আর পাবো,বল? তোর বাবারও খুব পছন্দ।'

'না পেলে আমি কী করবো? তোমারই তো স্বপ্ন-আমি যেন ইঞ্জিনিয়র হই। এখন এই শেষ সময়ে আমাকে ঝামেলায় ফেলতে চাও কেন বল তো?'

'ক্যানো, বিয়ে করে কেউ কি লেখাপড়া করছে না? মিঠু তো আমাদের নিজেদেরই ছেলে। নিজেও ইঞ্জিনিয়র। তোকে হেল্পও করবে।'

'ওহ্ মা, নিজেদের ছেলে বলে কি সে চুপটি করে বসে থাকবে ভেবেছ? জ্বালিয়ে মারবে। আর তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেলে চড় থাপ্পরও মেরে বসতে পারি। তখন?'

'বলিস কী? জামাই এর গায়ে হাত তুলবি? কী সর্বনেশে কথা!'

'অবাক হচ্ছো ক্যানো? তোমার মেয়ের রাগ ক্যামন- জানো না? রাগ হলে দ্যাখো না-কত কী ভেঙ্গে ফেলি? অপুটা অংক না বুঝলে ক্যামন পিটাই- সেটা তো দেখেছ।'

'তারপরও বলি-মেয়েরা অনেক কিছুই ম্যানেজ করতে জানে। তুই বুদ্ধিমতি। তুই আরো ভালো পারবি'। প্রেমা এবার একটু ভাবে। মায়ের মুখটা হাতে নিয়ে বলে,

'একটা কথা সত্যি করে বল তো মা। তুমি জেনে বুঝেও এমন উঠে পড়ে লেগেছ ক্যানো বল তো?। মাত্র তো দুটো বছর। মিঠু ভাই এর চেয়ে ভালো ছেলে কি আমি পেতে পারি না?'

'অবশ্যই পারিস। কিন্তু মেয়েদের মন-কখন কোথায় ডুব দিয়ে বসে- সে ভয়টা কি মায়েদের হয় না?'

'না হয় না। অন্তত আমার মা সেই রকম মা না। আর আমিও ডুবে যাবার মেয়ে না। সো ডোন্ট ওয়্যারি।'

'ক্যানো,তোর মামা ফজল না গজল কী একটা নাম বলছিল- তোকে নাকি খুব ইয়ে টিয়ে করে...তোর ফেসবুক দেখেই তো বললো.'

'ও...এই কথা! তুমি ভেবেছ আর দশটা মেয়ের মতো আমিও ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি? কী যে বল না মা। আজব! এক সাথে পড়লে বন্ধুত্ব হতে পারে না?.'

'বন্ধুত্ব থেকেই তো ইয়ে টিয়ে হয়। তোর তো কোন ছেলে বন্ধুও ছিল না। এখন আবার এগুলো কী?'

'প্লিজ মা শোন,ওই রকম কোন বনধুত্ব না। লেখাপড়ার জন্য যতটুক দরকার ততটুকুই। সেই ক্লাস নাইন থেকে কতজনই তো হাত বাড়িয়েছে,বাসা পর্যন্ত ফলো করেছে,ফুলের মধ্যে চিঠি লিখে ভয় দেখিয়েছে-কই ডুবেছি? সবই তো তুমি জানো মা।' মা শায়লা বেগম এরপর আর কোন কথা খুঁজে পান না। তবে সন্তুষ্টও হতে পারেন না।

০২.

'তোমাকে নিয়ে আমি কী করি বল তো? বলদ চেন, বলদ?'

'কেন, কী হয়েছে? বলদ চিনতে হবে কেন?'

'ওইটাকে না চিনলে তো তোমার হুঁশ হবে না। কতবার বলেছি- ফেসবুকে এমন কিছু লিখো না যাতে আমার সমস্যা হয়। ফেসবুক এখন সবাই দ্যাখে। মা তো দ্যাখেই,আমার যে মামাটা ফেসবুক চিনতোই না, সে-ও এখন ফেসবুক চষে বেড়ায়। তুমি কোথায় কী লিখেছ আমার নামে- সেটা মামা তো দেখেছেই,মার কান পর্যন্তও গ্যাছে। ক্যানো, ইনবক্সে বা ম্যাসেঞ্জারে লিখতে পারো না?'

'আমি তো কিছু লিখি নি। প্রেমা নামে সুন্দর একটা কবিতা পড়েছিলাম এক কাগজে। সেটাই পোস্ট করেছি। আফটার অল আমার প্রেমাকে নিয়ে কবিতা। সবাই একটু দেখবে না?' খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাটা বলে সজল।

'আমার প্রেমা মানে? কখনো কি বলেছি যে আমি তোমার ? এটা কেমন কথা? আমি তো তোমাকে এখনই রিজেক্ট করে দিতে পারি। কী, পারি না?'

'না পারো না। কারণ তোমার ওই স্টোন হার্টের ভেতরে খুব নরোম একটা স্পেস আছে। সেটা এই আমি। বুঝেছ? ' সজলের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

'আহা,কী আমার অন্তর্যামি রে! প্রেমা যে কতটা হার্ড হতে পারে-সেটা জানো?। রেজাল্টটা যদি আমার চেয়ে খারাপ হয়,তখন বুঝবে। আর নতুন যে জ্বালাটা শুরু হয়েছে সেটা শুনলে তো তোমার ওই স্পেস ছেড়ে এখুনি পালাবে । '

'সেটা আবার কী?'

'মেয়ে বড় হলে মায়েদের কী হয় জানো না? কন্যা বিদায়। বোঝা গেল?'

'সে কী! তোমার মা তো তোমাকে ফাইনালের আগে বিয়েই দেবে না শুনেছি। এখন আবার ওসব ক্যানো'?

'ক্যানো,তার আমি কী জানি? আমার এক কাজিন মিঠুভাইকে মা'র খুব পছন্দ। এক চুল ছাড়া তাকে রিজেক্ট করার কোন অজুহাত নেই। সে আমার পড়াশোনা চালাতে দেবে-এই এ্যাসুওরেন্স পেয়েই মা মহাখুশি। এখন বোঝ ব্যাপার-টা কত ক্রিটিক্যাল?'

'তো মত দিলেই তো পারো। সমস্যা কী?'

'সমস্যা কী মানে? ও কি আমাকে পড়তে দেবে? বউ পেলেই তো তোমরা ছেলেরা পাগোল হয়ে যাও। তাছাড়া ওর পড়াশোনার ক্যারিয়ার তো আমার চেয়ে অনেক ডাউনে। আমি ওর চেয়ে ভালো রেজাল্ট করি- সেটা তো ও অবশ্যই চাইবে না। এটা সেটা বলে ডোমিনেট করবে। বোঝ এসব কিছু? '

'বুঝলাম। তুমি যে মানবে না সেটাও বুঝি। কিন্তু চুল নিয়ে কী যেন বলছিলে...?'

'হ্যাঁ,ওটা তো মাথার অর্ধেকটাতেই নেই। অবশ্যই বড় একটা ইস্যু বাট আমি জানি মা আমার পড়াশোনাকেই সবচেয়ে বেশি প্রায়রিটি দেয়। সেজন্যে ওটাকেই ঢাল বানিয়ে আপাতত ঠেকিয়েছি কিন্তু ফাইনালে কী যে হবে জানি না।' হঠাৎ সজলের চুলের দিকে চোখ রাখে প্রেমা। কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে,

'সজল,চুলগুলোর এ অবস্থা কেন? দু'এক জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা দেখছি। কোন সমস্যা?' সজল একটু থতমত খেয়ে বলে,

'না তেমন কিছু না। ভালো করে আঁচড়ানো হয় নি তো। সেজন্যেই হয়তোবা।' সজল কি ঠিক বললো? না লুকালো? নিশ্চিত হতে পারে না প্রেমা।

০৩. মা শায়লা বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। মেয়ের জন্য এ্যাতো ভালো একটি সম্বন্ধকে কিছুতেই তিনি হাতছাড়া করতে চান না। নিজের খালাতো বোনের ছেলে মানে ঘরেরই ছেলে। কোনদিক থেকেই সে প্রেমার অযোগ্য নয়। সবচেয়ে বড় যে প্রেমার লেখাপড়া- সেটার নিশ্চয়তাটুকু পাওয়া গেছে। রাজশাহীতেই ছেলের চাকরি। প্রেমাও রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। বলতে গেলে মায়ের কোলেই থাকবে সে। কিন্ত প্রেমাটা বুঝছে না কেন? নিজের পছন্দ করা কেউ যে নেই সে ব্যাপারে শায়লা বেগম নিশ্চিত। কারণ ছেলেদের নিয়ে কিছু হলে মাকে বলতে দ্বিধা করে না প্রেমা। ফেসবুকে বনধু টন্ধু কেউ কেউ থাকতে পারে, সেটা কোন ব্যাপার না।

কিন্তু মেয়েটার হার্ট বলে কি কিছু নেই? বয়সজনিত আবেগ উচ্ছ্বাস,অকারণ বিষন্নতা? এসব কিছুই তো চোখে পড়ে না ওর মুখে । শুধু পড়া আর পড়া,অবসর পেলে বাচ্চাদের মতো গেমস খেলা,নয়তো ছোট ভাই অপুটার সাথে খুনসু-টি। মেয়েটা কি বড় হচ্ছে না? ম্যাচুরিটিতে কি কোন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে? কিন্তু লেখাপড়াতে তো কোন ঘাটতি নেই। এ পর্যন্ত সবগুলো ক্লাসেই সে ফার্স্ট পজিশন ধরে রেখেছে। স্কুল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং-সবখানেই সবার ভালোবাসা পেয়ে আসছে। মেয়ের এই দিকটি নিয়ে শায়লা বেগম বরাবরই সুখি। কিন্তু বয়সের এই আবেগ উচ্ছ্বাসমাখা সময়-টিতে মেয়েটি এ্যাতো নিস্পৃহ ক্যানো? পনেরতে যেমন ছিল,এখন বাইশেও তেমনি। ছেলেদের নিয়ে এ রয়সের মেয়েদের যে স্বাভাবিক কৌতুহল, সেটা থাকবে না? এটা ক্যানো হবে? ছেলেদের ব্যাপারে ওর ধারণাটা আবার নেগে-টিভ না তো! ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও বিয়ে হয়তো দেয়া যাবে কিন্তু ছেলেটাকে যদি ও ভালোবাসতে না পারে? তাহলে তো দু'জনেরই লাইফ শেষ। নাহ্,এটা হতে দেয়া যায় না। একটা সিদ্ধান্তে এলেন তিনি। রাতে মেয়েটার সাথে আবারো মুখোমুখি হয়ে যতটা সম্ভব খোলাখুলি কথা বলবেন। সমস্যা কী? নিজেরই তো মেয়ে।

রাত ন'টার পরে প্রেমার ডাক পড়ে মা'র ঘরে।

'ডাকছিলে মা? জরুরি কোন কিছু?'

'না মা। জরুরি তেমন না। এমনি একটু আলাপ করতাম। তোর বাবাটা হঠাৎ বিদেশে চলে যাবার পর খুব একা লাগে রে। তোর তো সময়ই হয় না।'

'ঠিক আছে ,এই আমি বসলাম। বল কী বলবে। '

'তেমন কিছু না মা। সকালে বিয়ের কথা বলে তোর মনটা খারাপ করে দিলাম। তারপর থেকে ভালো লাগছিল না।'

'তো কী ভাবলে,মাথা থেকে ওটাকে তাড়িয়েছ?'

'না,ওটা কিছু না। তোর সাথে তো অনেক কিছুই শেয়ার করি। তুইও করিস। তবু একটা ব্যাপার এখনও বুঝে উঠতে পারছি না রে।'

'কী সেটা?'

'আচ্ছা মা,এখন তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস। ছেলেদের নিয়ে ভাবিস কিছু?'

'ওদের নিয়ে ভাবাভাবির কী আছে? ওরা কি মেয়েদের কোন সন্মান দেয়? একটু ভালো করে কথা বললেই পেয়ে বসে। বান্দরের মতো মাথায় উঠতে চায়।'

'তেমন কেউ উঠেছে নাকি তোর মাথায়? 'শায়লা বেগম মৃদু হাসেন।

'জানি তো এটা বলবে। শোন মা, তোমার কাছে আজ পর্যন্ত কোন কিছু হাইড করি নি। আজও করবো না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে বলতেও ঘেন্না হয়। হয়তো আমাকে ভুলও বুঝতে পারো।'

'তবুও বল। আমি কিছু মনে করবো না। আমি তো আমার মেয়েকে চিনি।'

'ওকে। শোন তাহলে। রাকিব নামের একটা ছেলে। বেশ ভদ্র। আমার দু'বছরের সিনিয়র। মাঝেমধ্যে ওনার কাছ থেকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাজেশন নিতাম। যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতাম। তো একদিন রাকিব ভাই বললেন প্রেমা,এখন তো তোমার ক্লাস নেই,একটা নতুন টপিকস নিয়ে আলাপ করতে চাই। তো আমরা কি ওই লেকের পাড়ে একটু বসতে পারি? আমি বললাম-ক্যানো,এই লিচু গাছটার নীচেই তো বেশ নিরিবিলি। সমস্যা কী? উনি বললেন-না আসলে এখানে চেনাজানা অনেকেই আছে, কেউ এভাবে দেখলে কিছু মনে করতে পারে। আমি আর আপত্তি না করে লেকের দিকে হাঁটতে লাগলাম। লেকের কাছে যেতেই দেখি জায়গাটা বেশ ঢালু। আগে এমনটা ছিল না। আমি নামবো কিনা ভাবছিলাম-হঠাৎ রাকিব ভাই আমার হাতটা ধরে বললেন-কী, ভয় পাচ্ছো? এবার নামো। পড়বে না। আমার তো রাগে ভেতরটা জ্বলছে। নেমেই হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। ভেবেছিলাম ওখানেই হয়তো বসা হবে। কিন্তু না । তিনি এগোচ্ছেন। সামনে মন্দিরের মতো ছোট্ট উঁচু একটা ঘর। সিঁড়িটা বেঁকে বেঁকে ওই ঘরটার দিকে উঠে গেছে। রাকিব ভাই বললেন-এখানে মনে হয় কখনো আসো নি। অনেক পুরোনো একটা মন্দির। দুজন প্রেমিক প্রেমিকা বাবা মার অমতে বিয়ে করে ভয়ে এখানে পালিয়ে থেকেছিল। পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এরপর কারা যেন এটাকে 'প্রেম মন্দির' নাম দিয়ে মন্দিরের মতো করে বানিয়ে রেখেছে। যারা নতুন প্রেমে পড়ে তারা একবার করে আসে এখানে দেখতে। আমি বললাম- তো আমরা এসেছি ক্যানো? আমরা কি প্রেমে পড়েছি? রাকিব ভাই যেন আকাশ থেকে পড়েন। বলেন-ক্যানো..পড়িনি! আমি তো ভেবেছিলাম আমার মতো তুমিও...'তাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম না। বললাম-স্যরি রাকিব ভাই, ভালোবাসার নষ্টামিটা এখনও আমার মধ্যে ঢোকে নি। আপনি ভুল মানুষের হাত ধরেছেন। চলুন ফিরে যাই।' প্রেমা থামে। চোখদুটো ততক্ষণে ছলছল করছে প্রেমার। মাকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে,বল মা আমি কি ভুল করেছি? ছেলেরা এমন ক্যানো মা? একটু হেল্প চাইলেই হাত ধরে ফ্যালে। একটু কাছাকাছি এলেই হা করে গিলে খেতে চায়। এর নাম কি ভালোবাসা মা? এমন ভালোবাসাকে কীভাবে শ্রদ্ধা করবো বল?' অনেকক্ষণ এভাবে কাঁদার পর মা শায়লা বেগম প্রেমার মুখটি তুলে ধরে বলেন,

'তুই ঠিক করেছিস মা। আমার প্রেমাই তো এমন করে ভাববে। না হলে তুই প্রেমা কেন। আজ আমার সব দুর্ভাবনাই কেটে গেল। বিয়ে নিয়েও তোকে আর জোর করবো না। তুই নিজে চিনতে শেখ মা। সে-ই ভালো।'

০৪. প্রায় পাঁচ দিন হলো সজল লাপাত্তা। সেলফোনটাও বন্ধ। বাসায় খোঁজ নিয়ে শুধু জানা গেছে সপ্তাহখানেক আগে কী এক জরুরি কাজে ঢাকায় গেছে সে। সেই থেকে সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ। কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ হলো কী ছেলেটার। আলাদা এক স্বভাবের ছেলে সজল। ভীষণ চঞ্চল। আর মেধাবিও। চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে সারা ক্যাম্পাস মাতিয়ে রাখে। শুধু প্রেমার সামনে এলেই একেবারে সুবোধ শান্ত অনুগত ছেলে। প্রেমা চাইলে সে তখন পাহাড়ও কেটে এনে দিতে পারে। ওর এই ছেলেমি স্বভাবটিকে খুব এনজয় করে প্রেমা। একটা মুগ্ধ করা ভালোলাগাও জন্মে গেছে ওর অজান্তে।

তবে ওইটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছুর ভাবনা আপাতত নেই ওর । সজল হয়তো সেটা পারে নি। না পারুক। বাড়াবাড়ি করার মতো ছেলে ও না, প্রেমা জানে। তো যে সজল সবকিছুই শেয়ার করে প্রেমার সাথে, সেই ছেলে প্রেমাকে কিছুই না জানিয়ে উধাও হতে পারলো কী করে! উদ্বেগের সাথে তখন একটা অভিমানও জমতে শুরু করে বুকের ভেতর। প্রেমা তারপরেও ভাবে- কোন ট্র্যাপে পড়লো না তো! কিংবা গুম টুম কিছু! এসব টেনশনে ঘুম,পড়াশোনা সবই গ্যাছে প্রেমার। কারো সাথে শেয়ারও করতে পারছে না ব্যাপারটা। সারাক্ষণ ফেসবুক, সেলফোনে চোখ রাখছে-যদি কোন খবর মেলে। অবশেষে নিখোঁজের সপ্তম দিনে একটা মেসেজ আসে প্রেমার ফোনে । সজলের মেসেজ। 'আমি ধানমন্ডির একটা ক্লিনিকে আছি। ভালো আছি। চিন্তা করো না। শিগগিরই আসছি।' ওহ্,একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে যেন মুক্তি মেলে প্রেমার। সজলের সেলফোনটি তখনও বন্ধ পেয়ে রাগে অস্ফুটো স্বরে বলে,'উহ্,এ্যাত্তো কষ্ট দিতে পারো তুমি সজল!'

দিন তিনেক পর। প্রেমা ক্লাসশেষে দোতলা থেকে নামছিল। সেলফোন বেজে ওঠে। সজল।

'রাগ করো না প্রেমা। চুলগুলো উঠতে উঠতে মাথাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। ভয় পাচ্ছিলাম তোমার সামনে যেতে। তুমি তো টাকুদের পছন্দ কর না। তো সোজা চলে এলাম ঢাকায় আমার এক পরিচিত কসমেটিক সার্জারির ক্লিনিকে। মাথার পেছন থেকে চুল এনে সামনের পার্টে ছোট ছোট হোল করে চুলগুলো ধানের চারার মতো রোপন করার কাজ চলছে। দারুণ লাগছে দেখতে চুলগুলো। আরেকটু বাকি আছে। এটাকে বলে 'হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট'। কী ঠিক করি নি?'

'না করনি। ফার্স্টলি- আমাকে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না। কারণ আমি এখনও তোমার কেউ নই। সেকেন্ডলি- সবাইকে এভাবে টেনশনে রেখে একদম ভালো কর নি। সামনে আসো। তোমাকে ফাইনালি রিজেক্ট করে দেব।' প্রেমার গলা থেকে ঝাঁঝালো ক্ষোভ ঝরে পড়ে।

'পারবে না প্রেমা। তুমি ভালোবাসতে ভয় পাও। আমিই তোমার ভালোবাসার অভয়ারণ্য। জানো কি সেটা? '

'বাজে বকো না। এসব কথায় আমি ভিজি না। আসছো কবে ?'

'আমার এখন সেকেন্ড সেশন চলছে। সুঁচ দিয়ে ছোট ছোট হোল করে চুল ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে। একটু ব্যথা লাগছে। একটু রক্তও ঝরছে। অলমোস্ট সারা মাথাই এখন রক্তে লাল। তুমি এখন আমাকে দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে।'

এরপর ফোনে অনেকক্ষণ কথা নেই প্রেমার। দ্রুত নি:শ্বাসের সাথে ফোঁপানির শব্দ পায় সজল।

'কী হলো কথা বলছো না কেন প্রেমা? তুমি কি কাঁদছো?'

'না কাঁদবো ক্যানো,হা হা করে হাসছি। তুমি আমার জন্য কেন এ্যাতো কষ্ট করতে গেলে সজল? ক্যানো? ক্যানো? কে আমি তোমার?' চেপে রাখা কান্নাটাকে আর ধরে রাখতে পারে না প্রেমা।

'যাতে রিজেক্টেড না হই সেই ভয়েই তো। আমি যে তোমার মতো কঠিনেরেই ভালোবাসতে চাই প্রেমা,যাতে আমার এই উড়নচন্ডি মনটাকে সামাল দিতে পারো ...।'

'তুমি আসো আগে। তুমি আমাকে অনেক কাঁদিয়েছ। তোমার সব চুল আমি উপড়ে ফেলবো একটা একটা করে। তখন তোমার এই মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসা কোথায় থাকে দেখবো।' ফোনটা নামিয়ে রাখার পরেও ফোঁপানো কান্নায় চোখ মুছতে থাকে প্রেমা। এ যেন এক নতুন উপলব্ধি ওর। বুকের ভেতরেও চাপ চাপ পাথর ভেঙে পড়ার এক মোহ-নীয় শব্দ। এ শব্দ তার অচেনা। ভয়েরও। তবুও অপূর্ব সে শব্দ! কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে প্রেমার। অবুঝ এক মুগ্ধতায়...।

রাহমান ওয়াহিদ ॥
বরিষ্ঠ কবি, কথাসাহিত্যিক

লোকালয় থেকে দূরে

মীর লিয়াকত আলী

দিনটা ছিল শুক্রবার।

ঘড়িতে সময় তখন সকাল সাতটা। সাধারণতঃ এ সময়টা ছিল আমার ব্রেকফাষ্ট আওয়ার। এদিন আর ব্রেকফাষ্ট হলো না। কারণ ঐ সময় আমি মৃত্যুবরণ করলাম। এমনিতে তখন কোন অসুখ বিসুখ ছিল না। বয়সের হাফ-সেঞ্চুরী হবার আগে পরে সবাইকেই কমবেশী যেমন মৃত্যুচিন্তা পেয়ে বসে হয়তো আমারও সে চিন্তা ছিল। রবীন্দ্রনাতের মৃত্যুচিন্তাও মনে হলো। চিরসত্য মৃত্যু তো এভাবেই আসে। ঠিক সকাল সাতটায় মারা গেলাম আমি।

আমার নিঃশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে আসছিল তখনি মনে হলো মারা যাচ্ছি আমি। কারণ এর আগে নিঃশ্বাস ব্যাপারটা এতো জরুরী কখনো মনে হয়নি। আর এভাবে নিঃশ্বাসের সাথে যুদ্ধও করতে হয়নি। চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এলো। নিঃশ্বাস ফেরৎ নেয়ার ব্যর্থ কসরৎ করলাম। পারলাম না। নিজ ধর্ম অনুযায়ী আমি অনেক কষ্ট করে কলেমা পড়ে নিলাম। কখনো নিঃশ্বাস একেবারেই বন্ধ আবার একটু একটু নিতে পারছি। ভাল লাগল যখন কলেমা শেষ করতে পারলাম। মনে হলো এমনি সময় কলেমা পড়াই একমাত্র কাজ। আবার মনে হলো পরিবারের সবাইকে কি কি যেন বলার ছিল। অত্যন্ত জরুরী কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি করে যাওয়া জরুরী ছিল। উঁহু বলা গেল না। জীবন খাতায় এতোগুলো পৃষ্ঠা উল্টে গেলাম তখন কেন এতো জরুরী বিষয়ের কথা মনে হলো না। প্রচুর সময় পেয়েও কোন কিছুই শেষ করে যাওয়া হলো না।

হঠাৎ আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। কোথায় যেন ব্যথা শুরু হল। বুঝতে পারলাম না। বোঝার চেষ্টা করতেও ভাল লাগলো না। একটা প্রচণ্ড গোলাকৃতি কুচকুচে কালো অন্ধকার কুণ্ড আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই দপ করে নিভে গেল যেন সব কিছু। সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল নিঃশ্বাস। চোখ যেন বেরিয়ে আসছে কোটর ছেড়ে। হঠাৎ বিদ্যুতে মত মনে হলো এখনই বোধ হয় এসে পড়বেন আযরাইল! এই যে দম বন্ধের কষ্ট– আযরাইল কি কবয করছেন প্রাণ! কিন্তু তাঁকে দেখছি না কেন? পরক্ষণেই মনে হলো কোরান হাদিস অনুযায়ী জীবন্তকাল যদি অতিবাহিত করে যেতে পারতাম তাহলে হয়তো তাকে দেখতাম। পুরোপুরি সঠিক পদ্ধতিগতভাবে চলতে পারিনি বলেই হয়তো অনেক কিছুই দেখা থেকে বঞ্চিত হলাম। এ সময়ের অভিজ্ঞতা তো জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে মাত্র একবারই আসে। কি সে অভিজ্ঞতা তাতো কারো পক্ষে বলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই যে আমি দেখছি আমিও তো অন্য সবার মতো কিছুই বলে যেতে পারলাম না। কেউ বলতে পারে না। অথচ সব সময়ের চেয়ে এ সময়ই শ্রেষ্ঠ সময়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ আমার শ্বাস প্রশ্বাস! লক্ষ করলাম পেটটা বড় হয়ে ফুলে উঠেছে। জীবিতকালে আমি যত মৃতদেহ দেখেছি সবারই পেট এভাবে ফোলাই দেখেছি। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না মৃত্যু হবার পরও আমি তো সব দিনের আলোর মত বুঝতে পারছি। সব ধরনের সেন্সই তো আমার রয়েই গেছে। বুঝলাম এভাবে সবারই হয়তো থাকে। কেবল শরীরটাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়েছি আমি। ইচ্ছে করলেই নড়তে পারছি না, কোন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারছি না। বুঝলাম এসব ক্ষমতা লোপ পেয়েছে আমার। পরীক্ষা করতে চাইলাম! না অসাড় হাতটা আমার কথায় উঠলো না। নড়লোনা পা। আমার স্ত্রীকে সজোরে ডাকার চেষ্টা করলাম। ডাকলাম চিৎকার করে ছেলে মেয়েদের। না, মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম প্রকৃতভাবেই আমি এখন মৃত। সুন্দর এ পৃথিবীর সাথে আমার সম্পর্ক শেষ। এখন আমি অন্য লোকের অধিবাসী।

একটা ব্যাপারে আমি বার বার আশ্চর্য হচ্ছি মৃত্যুর পরও এত স্পষ্টভাবে আমার সেন্স থাকছে কি করে। সবার বেলায়ই কি এমন হয়? মনে পড়লো আমার ধর্মীয় শিক্ষক, মা-বাবাদের কথা। তারা বলতেন মৃত্যুর পর রুহু সব দেখতে পায় তাহলে এই যে আমি সব দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পারছি। এটাই কি আমার ভেতরের রুহু? আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার বাড়িতে প্রজাপতি এসেছিল– বসেছিল আমার কাছে। আমি সবাইকে বলতাম বাবার রুহু এসেছে। সবইতো সত্যি! কিছুইতো মিথ্যে নয়! আমিও কি প্রজাপতি হবো? কখনো?

আমি প্রায়ই সকালে উঠে কোরান শরীফ নামায পড়ার পর আবার ঘুমাতাম। স্ত্রী হয়তো মনে করেছেন তাই– তিনিও ডাকলেন না। তাছাড়া ছুটির দিন আমার অফিস নেই। দেখলাম আমার পাশ দিয়ে ছেলেটা তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। ডাকলাম– ডেকেই মনে হলো সেতো শুনবে না। কে একজন গেটে কলিংবেল বাজালো।

আমার স্ত্রী ভেতর থেকে জবাব দিলেন 'কে!'

ভারী কণ্ঠ শুনলাম 'এটা সাংবাদিক সেলিম রানার বাসা?'

আমার স্ত্রী বললেন 'জ্বি! তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

'বিকেলে এলে পাওয়া যাবে?'

'জ্বি! যাবে! আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। হোটেলে উঠেছি। আমার একটা সমস্যার কথা পত্রিকায় লেখার জন্য তার সাথে কথা বলতে চাই।'

'আপনি বিকেলে আসুন।' আমার স্ত্রী বললেন।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার হাসি পেল। বিকেলে কি পাওয়া যাবে আমাকে? আর পাওয়া গেলেও সমস্যার কথা পত্রিকায় লিখলেই কি এদেশে সমাধান পাওয়া যায়? ছুটোছুটি লেখালেখি করা যায় কিন্তু অভীষ্ট ফল পাওয়া দুষ্কর। সাংবাদিকের কলমের খোঁচায় মুহূর্তে গণমানুষের সমস্যা দূর হবে আর সমস্যা সৃষ্টিকারীরা ঐ সাংবাদিকের অরক্ষিত পিঠের চামড়া তুলে নেবেনা এ দৃশ্য কবে দেখা যাবে আমাদের দেশে? কে শোনাবেন এমন আমার বাণী? কি ভাবছি আবোলতাবোল? দেয়াল ঘড়িটা দেখলাম। ন'টা বাজে! কি ব্যাপার আমি তো মৃত– ঘড়ির সময়ও তো ঠিক ঠাক দেখতে পাচ্ছি। আমার স্ত্রী এসে মশারী তুললেন, আমাকে ডাকলেন। লোকজন ডেকে ডেকে যাচ্ছে আর উনি ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে। কিছুক্ষণ গজর গজর করেও যখন আমার স্ত্রী কোন সাড়া পেলেন না তখনি ধাক্কা দিলেন। ডাকলেন। আমি জবাবও দিলাম। কিন্তু তিনিতো শুনছোন না কিছুই। আমার স্ত্রী আমার হাত ধরে ডাকার চেষ্টা করলেন। তার হাত থেকে আমার হাত পড়ে গেল। হয়তো হাত ঠাণ্ডা দেখে ঘাবড়ে গেছেন তিনি।

আমিও অনুভব করলাম আমার শরীর ঠাণ্ডা। রক্ত চলাচল নেই বলেই হয়তো! আমার চিবুক ধরে আমার দিকে চাইলেন। পলকহীন চোখ। দেখেই আমার স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। কারণ অসুখবিসুখহীন জলজ্যান্ত একটা মানুষ তো আর এমনি এমনি মরে যেতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর যে বহুরূপ! এ রূপের শেষ নেই।

বড় ছেলে বাইরে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো। বুড়ো মাও এলেন। মামাকে ডেকে আনা হল। ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হলো। দু'একজন প্রতিবেশী এলেন। কিভাবে কি হলো প্রচণ্ড কান্না নিয়ে তাদের বলছেন আমার স্ত্রী সেহেরা খাতুন। বাচ্চারা কাঁদছিল। বড় মেয়েটাই বেশি।

একবার ইচ্ছে হলো ওদের কাঁদতে বারণ করে সান্তনা দিই–

'তোমরা কান্নাকাটি কর না। এভাবে সবাইকে যেতে হয়। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার!'

কিন্তু আমার কথা তো ওরা শুনতে পারেনা। জীবিত ও মৃতদের মধ্যে তো এটাই ফারাক! জীবিতরা লোকালয়ে মৃতরা লোকান্তরে। ডাক্তার এলেন। সময় নষ্ট হলো না। দেখেই আমাকে মৃত ঘোষণা কররেন। তারপরই পড়লো কান্নার রোল! অথচ আশ্চর্য ওদের কান্না দেখে আমার কিন্তু কষ্ট হলো না। আমার মনে হলো এ কান্না অহেতুক। চিরন্তন সব কিছুকে চিরন্তন হিসাবেই নেয়া ভাল। কিন্তু তবু তো মানুষ কাঁদে।

আমার স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে এবং বাচ্চাদের অন্য রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। মা বসলেন আমার কাছটায়। বিলাপ করে কাঁদছেন। তাঁকেও সরিয়ে নেয়া হলো। প্রতিবেশীরা পালা করে ছুটে এলেন। দুজন আলেমকে আনা হলো। আমাকে বিধি মোতাবেক শুইয়ে চাদর ঢেকে দেয়া হলো। পবিত্র কোরান পাঠ শুরু হলো। জ্বালানো হলো আগর বাতি– আনা হলো আতর! আমার আব্দুল আলীমের ঐ গানটার কথা মনে হলো। 'আমারে সাজাইয়া দিও নওশার সাজন।' মনে করার চেষ্টা করলাম কে যেন লিখেছিল গানটা! না! মনে হলোনা! কয়েকজন মুরব্বী আমাকে কবরস্থ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়ার ব্যবস্থা হলো। হঠাৎ মনে হলো এই যে প্রায় সারাজীবন সামাজিক কাজে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম আর এখন সবার কাছে আমি যেন অস্পৃশ্য! কেমন করে কত দ্রুত আমাকে কবরে রাখা যায় তাতেই যেন সবার আগ্রহ। বন্ধুমহল ছুটে এলো। দুঃখ করলো। আমার প্রশংসা হলো। বলতে শুনলাম 'আমি লোকটা নাকি ভালোই ছিলাম।' আমার জানাযার দাওয়াতের জন্য মাইকিং এর ব্যবস্থাও করা হলো। মাইকিং এর আওয়াজও কানে এলো। শুনলাম 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন...।' একবার মনে হলো মাইকের ঘোষককে সতর্ক করে দিই যাতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়। কারণ জীবিত অবস্থায় আমি যখনই মৃত্যুর ঘোষণা শুনতাম তখন দেখতাম যার মৃত্যু হলো তার নাম শোনারও সুযোগ পেতাম না।

ইন্নালিল্লাহে বলতে বলতে মাইক চলে গেছে বহুদূর! নাঃ সতর্ক করা হলো না। আমার কথাতো কেউ এখন আর শুনবেনা! আমি তো এখন এ জগতের অতীত। কান্নাকাটি চলছিল। অনেকের ঝরছিল চোখের জল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এতো কম সময়ের জীবনে কতো কিছুইতো আমরা করি। কী না করি না! কিন্তু মৃত্যুর মত তে বড় মহাসত্যকে কেন যে আমরা এতো গুরুত্ব দেই! মৃত্যুর মতো অতি সাধারণ ব্যাপার তো আর কিছুই নেই! কেবল একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র! আমার কাছে এ মৃত্যু তেমন কোন দাগই কাটলো না! আমার আশে পাশে যারা আছেন, আসছেন, যাচ্ছেন, দেখছেন, সবাইকে দেখলাম। এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জাগলো সবার প্রতি।

আমাকে আর কেউ কখনো দেখবেনা বলেই সবার কান্না। কিন্তু আমার তো মনে হলো আমি সবাইকে সবসময় অনন্তকাল দেখব। এ কারণেই হয়তো কাঁদছি না আমি!

পরিচিত-অপরিচিত অনেকেই এলেন। এক নজর সবাই আমাকে দেখলেন। মহিলাদের ভিড়ে এতক্ষণ দেখিনি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কয়েকজন মহিলার মাঝে অশ্রুসজল চোখে দাঁড়িয়ে আছে ঝিলিক। ওর কান্না আটকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু ঝিলিক এখানে এলো কি করে? কি করে জানলো এতো দূর থেকে আমার মৃত্যুর খবর? আর জানলেও আসলো কি করে? আর কে এসেছে ঝিলিকের সাথে? ঝিলিকের স্বামী? কোথায়? নাঃ দেখতে পাচ্ছি না তো! অনেকেই দাঁড়িয়ে! অনেকেই অপরিচিত! এর মধ্যে কোনজন ওর স্বামী? নাঃ চিনলাম না!

অনেকদিন পর দেখলাম ঝিলিককে! কমপক্ষে তিরিশ বছর পর। তবু ঝিলিক যেন সেই আগের মতই! বিয়ের পর ঝিলিক স্বামীর সাথে ভারতে চলে যায়। কি একটা চাকরি করে ওর হাজবেণ্ড দার্জিলিং-এ।

আমি আমার জীবদ্দশায় জানা-অজানা অনেক কাহিনী শুনেছি-লিখেছি। কিন্তু ঝিলিকের মতো ভালবাসার কাহিনী শুনিনি-লিখিনি। ঝিলিক আমাকে ভালবেসেছিল– পৌরাণিক যুগের ভালবাসার কাহিনীর মত সম্পূর্ণ অন্ধভাবে। ঝিলিক আমাকে ভালোবেসেছিল নিভৃতে। বহুকাল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি আমি। যখন জেনেছি তখন সে অন্যঘরে অন্যভাবে।

বিয়ের সময় ঝিলিক তার মা-বাবাকে বলেছিল আমাকে ছাড়া সে বিয়ে করবে না! বাবা ওর মনের বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বালিশের নীচে আমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে। পরে চিঠিটি আমি পেয়েছিলাম। বাবা বাধ্য হয়ে কৌশলে তাকে বিয়ে দেন। ঝিলিককে জানিয়ে দেন আমার সাথে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি। যখন বিয়ের দিন ধার্য হয় তখন আমি ফ্রান্সে তিন মাসের সফরে। যিনি বিয়ে পড়িয়েছিলেন তাকেও নাকি ম্যানেজ করেছিলেন ঝিলিকের বাবা! আলাদাভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় 'কবুলে'র প্রয়োজন করা হয় ঢাকায় একটা কমিউনিটি সেন্টারে। আমার নাম শুনে নিঃসংকোচে কবুল করে ঝিলিক! বাসর রাত থেকে শুরু করে অনকদিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল! তারপরই নাকি স্বামীর সাথে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয় ওকে। স্বামী জেনেছিল ঝিলিকের মানসিক সমস্যা আছে।

কোন কিছুই জানতাম না আমি! পরে যখন জেনেছি কিছুই করার ছিলনা আমার। ঝিলিক কখনো তার নিভৃত ভালোবাসার কথা আমাকে জানতে দেয়নি। নয়তো ওকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ কখনই ভালবাসার মত সময় সারাজীবনেও হয়ে ওঠেনি আমার। যা কিছুই হোক ঝিলিকের জন্য কষ্ট হয়েছে আমার।

কিন্তু এতোকাল পর আমার মৃত্যু শিয়রে কি করে এল ঝিলিক? ছটফট করতে লাগলাম– কি করে জানা যায়। আমার আশা পূরণ হলো। ওর স্বামীকেও দেখলাম। আমার এক শিক্ষকও ছিলেন আমার মৃত্যু শয্যায়। তাদের কথাবার্তা থেকে জানলাম ঝিলিকের স্বামী বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা। এখন চাকরি করছেন দার্জিলিংএ। প্রধানমন্ত্রী দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পুরস্কৃত করছেন। এ পুরস্কার গ্রহণের জন্যই তিনি সস্ত্রীক এসেছেন ঢাকায়। ঢাকা যাবার পথে আমার মৃত্যু সংবাদ শুনে ঝিলিক স্বামীকে নিয়ে এসেছে এখানে। আমার চাদরে ঢাকা নিষ্প্রাণ দেহের দিকে অপলক চেয়েছিল ঝিলিক। চোখের একটু আগের অশ্রু শুকিয়ে আছে। চলে যাবার জন্য স্বামী ডাকছেন শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলোনা। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল ঝিলিক। সবার সামনেই বসে পড়ে আমার পায়ের কাছে। চাদরের ওপরে আমার পায়ে দু'হাত ও মাথা রেখে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এখানে অনেকেই চেনেনা ঝিলিককে। মেয়েদের মধ্যে কে কে যেন তাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে বিফল হলো। পরে ওর স্বামী একরকম জোর করেই ওকে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর পর এখন মনের গভীরে প্রথম একটা অব্যক্ত কষ্ট অনুভব করলাম কিন্তু আমি স্বাভাবিক ছিলাম। জীবনের হাসি খেলায় ঝিলিকের ঘটনাও একটি। কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীতে এটা একটা ঘটনা হলেও আমি যে জগতে পৌঁছে গেছি সেখানে এসব কোন ঘটনাই নয়। পৃথিবীর একটা অন্যতম খেলাই। মনে পড়লো কবি নজরুলের সেই গানটি– 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।'

আচ্ছা! নজরুল কি কোরআন শরীফের সুরা 'আ'নকাবুত' এর 'ওয়ামা হাজিহীল হায়াতুদ্দুনিয়া ইল্লা লাহ্উওঁয়াইবুন' (৬৪) (আর পার্থিব জীবন খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুই নহে) এর মর্মার্থ নিয়েই এ অবিনাশী গানটি লিখেছিলেন? আমার সাথে কি দেখা হবে নজরুলের? তিনিও তো এখন আমার জগতে। দেখা যাক– লোকান্তরের এ স্থায়ী জগত কেমন হয়! ঐ একই সূরার পরের বাণীইতো 'ওয়া ইন্নাদ্দারাল আখিরাতা' অর্থাৎ লোকান্তরের জগৎই প্রকৃত জগত। আমার বর্তমান জগৎ অন্য জগৎ! ইহলোক বিশ্ব নিয়ে প্রভু খেলতে পারেন, 'প্রলয় সৃষ্টিকে পুতুল খেলা' মনে করে 'নিরজনে' খেলতে পারেন, কিন্তু পরলোকে প্রভু সব নিজের হাতেই গ্রহণ করেন– এখানে আনমনে তিনি খেলেন না। আমার চিন্তা চেতনার সময় কে যেন আমাকে বললেন একটা বিষয়ই প্রভু পরলোকে প্রাধান্য দেন তা হলো 'সততা'। যা ইহলোক থেকে সম্বল করে নিয়ে যাওয়া যায়। সততাই নাকি এ জগতে ভালোভাবে প্রবেশ করার 'টিকিট'। আমি অদেখা ঐ কণ্ঠকে বললাম আমি যে এলাম– এ টিকিট কি আমার আছে? কণ্ঠ আমাকে জানিয়ে দিল 'এটা আমি জানি না! তোমার আছে কিনা তা তুমিই ভালো জানো।' আর শোনা গেলনা সেই কণ্ঠ!

আমার জানাযা হলো। করারে শুয়ে থেকে শুনছি বলা হচ্ছে কোন দেনাপাওনা আছে কিনা! আমি জানি দেনাপাওনা আছে কিছুটা হলেও। কিন্তু সবাই মৃত্যুর পর দাবী ছেড়ে দেন। কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর পর একজন বলেছিল আমাকে সে পাওনাদার। আমি ঐদিনই তা শোধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি কেন এত সময় ও সুযোগ পেয়েও এসব শেষ করে গেলাম না। প্রতিমুহূর্তে এসব শেষ থাকা ভাল। যদিও আমি জানি আমার তেমন কোন ঋণ নেই। একটিই ঋণ থেকে গেল পরিপূর্ণ জীবদ্দশায়, বাবা মাকে সুখী করে যেতে পারিনি। বাবা আমার জগতে আর মা রয়ে গেছেন। এতো পৃথিবীর খেলা নয়। এখানে 'পাপ' থেকে গেল। থেকে গেল দুঃখ স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কিছু দিয়ে বা রেখে যেতে পারিনি।

আমি চললাম গোরস্থানে। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কবরে শোয়ানোর পর ফেরেশতাকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার। আশ্চর্য এ সময় ঠুনকো পৃথিবীর কিছু মনে হলোনা। আমার আসল ঠিকানা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কবরে শুইয়ে রেখে বাঁশ-মাটি দেয়া হলো। সবাই চলে গেলেন।

আমি কবরে শুয়ে আছি। এই প্রথম ভয় ভয় লাগলো। কেউ নেই কোথাও। আমি একা! সম্পূর্ণ একা! আমাকে এখানে একাই থাকতে হবে অনন্তকাল। পৃথিবীতে জন্মের পর থেকেই কোলাহল ছিল– ছিল কত কী! অথচ আমি জানতাম একদিন আমাকে আমার স্থায়ী ঠিকানায় আসতে হবে। অথচ এ স্থায়ী ঠিকানার জন্য কোন পুঁজি নিয়ে আমি আসিনি। কে ছিল না আমার? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা সবাইকেই রেখে এলাম। কই আমার কাছে তো এখন কেউ আসছেনা। তবে কি পৃথিবীতে সারাটি জীবন কেবলই নিষ্ফল শ্রম দিয়েছি। নিশ্চয়ই সবই নিষ্ফল শ্রম! আমি এখন এত চিন্তিত কেন? যদি সফল শ্রম দিয়ে আসতে সক্ষম হতাম তাহলে আমার চোখ মুখে এখন হাসির ঝিলিক ফুটে থাকতো।

ভাবলাম যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন আর পেছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। ফেরেশতার প্রশ্নোত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি। কিছুই দেখার উপায় নেই। সব সাড়াশীর অন্ধকারে নিমগ্ন।

হঠাৎ আযানের শব্দ শুনলাম। ব্যাপার কি! এখন আযান কিসের? এতো ফজরের আযান নয়। তবে কি এশার আযান? সময় ঠিক করতে পারলাম না। কয়েকটা পোকা আরশোলা আমার কাফনের উপর দিয়ে জোরেশোরে হাঁটাহাটি করছে। আমি ওদের পাশ দেবার চেষ্টা করলাম। ব্যাপার কি এখন তো আমি বেশ নড়াচড়া করতে পারছি। হাত বাড়িয়ে পোকাগুলোকে সরাতেও পারলাম। মনে হলো এখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ!

'আর কতো ঘুমোবে। জুম্মার আযান হয়েছে। জলদি ওঠো।'

স্ত্রীর স্পষ্ট কণ্ঠ শুনলাম। চোখ মেললাম। স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কি উঠতে পারবো?

হ্যাঁ পারছি। উঠে বসলাম।

শেষ হয়ে গেল স্বপ্ন।

ঘড়িতে সাড়ে বারোটা। এতোক্ষণ যা দেখলাম সবই স্বপ্ন? আমি কি এখনও এ জগতে?

স্বপ্ন এমন হয়? এতো জীবন্ত? এতো স্পষ্ট?

আমি কি এখনো লোকালয়ে?

লেখক মীর লিয়াকত আলী ॥
সম্পাদক ঊর্মি

মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতন

অপূর্ব শর্মা

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা যে নারকীয়তা চালিয়েছিলো সারা দেশ জুড়ে তার চিহ্ন, যন্ত্রনা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে অগনিত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী মানুষ। বিশেষ করে পাক পশুদের লালশার শিকারে পরিণত হওয়া নারীরা যুদ্ধ শেষের চারদশক পরও ভুলতে পারেন নি যন্ত্রনাময় সেইসব দিনরাত্রির কথা, বিভৎসতার কথা। নিজ জীবনে আকস্মিকভাবে নেমে আসা বিপর্যয়ের কথা মনে করে তাঁরা চোখের জলে বুক ভাসান এখনও।

একাত্তরে শারিরীকভাবে নির্যাতিত হওয়া এসব নারী মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে হয়েছেন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। সমাজ, সংসার তাদের প্রতি যতটা সহানুভূতিশীল আচরণ করার কথা ছিল তাতো করেইনি বরং তাঁরা সমাজে হয়েছেন ধিকৃত, পরিবারে হয়েছেন নিগৃহীত। লাঞ্চনা, গঞ্জনা, তিরস্কার আর কটাক্ষ হয়েছে তাঁদের নিত্যসঙ্গী। সামাজিক নির্যাতনে জর্জরিত এসব নারী প্রত্যাশিত প্রতিদান পাননি, নিজের পীড়নের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকে। সরকার ইতিমধ্যে চার শতাধিক বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

নিপীড়নের শিকার সবশ্রেণীর নারী

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। অগ্নিগর্ভ সময়ে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া নারী সংখ্যায় হয়তো কম, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সহযোগিতা করেছেন নারীরা। যুদ্ধে সহায়তা প্রদান ছাড়াও শত্রুর হিংস্র আঘাত বড়ভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে তাদের। সেই লড়াইয়ে অনেকে দিয়েছেন প্রাণ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তাদের এদেসীয় দোসররাও '৭১ মেতে উঠেছিল আমাদের মা-বোনদের শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলায়।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত–সবশ্রেণীর নারীই স্বাধীনতার জন্য হয়েছেন যৌন নিপীড়নের শিকার। কিশোরী, যুবতি,

রমনী কেউই রেহাই পায়নি বর্বরদের হাত থেকে, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তাঁদের শরীর।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেসব নারীরা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের বিড়ম্বনার ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থেকে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাদের পরিবার নতুন করে যেন সামাজিক লাঞ্চনার শিকার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখায় তাঁরা সামাজিক নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একই শ্রেণীভূক্ত অনেকেই সেই পীড়ন ঢাকতে চিরদিনের মতো পাড়ি জমিয়েছেন ভারতে।

নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে যারা যৌন পীড়নের শিকার হয়েছেন, সেই 'অবলাদের' ঘটনা সমাজে যেন ক্ষতের মতো এখনও জেগে আছে। একাত্তরে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা তাঁদের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। এসব নারী কারো কাছেই মুখ ফুটে বলতে চান না নিজেদের নিদারুণ অতীত অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু তাদের নির্যাতন বরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে সমাজের একটি শ্রেণী।

নারী নির্যাতনে সমর্থন ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের

একাত্তরে নয় মাসজুড়ে দেশব্যাপী পাকবাহিনী নারী-নির্যাতনের যে বর্বরতা ঘটিয়েছিল তার পেছনে ছিল বাঙালি জাতির প্রতি তাদের তীব্র বিদ্বেষী মনোভাব। পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজীর বক্তব্যে নারী নির্যাতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়েছে। 'ইস্ট পাকিস্তান: দ্য এন্ড গেম' বইয়ে লেখক ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী নিয়াজীর উক্তি ব্যক্ত করেন। জেনারেল নিয়াজী সেনাবাহিনীর সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন– 'আপনি এরূপ আশা করতে পারেন না যে, সৈন্যরা থাকবে, যুদ্ধ করবে এবং মৃত্যুবরণ করবে পূর্ব পাকিস্তানে আর যৌন চাহিদা নিবারণ করতে যাবে ঝিলামে!' এতে সহজেই অনুমেয় বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে নারী নিপীড়নে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। আর একারণে অকপটে বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠে পাক পশুরা।

নারীবাদী গবেষক ঝঁংধহ ইৎড়হিসরষষবৎ-এর মতে, 'একাত্তরের ধর্ষণ নিছক সৌন্দর্যবোধে প্রলুব্ধ হওয়া কোন ঘটনা ছিলনা আদৌ; আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের নানী-দাদীর বয়সী বৃদ্ধাও স্বীকার হয়েছিল এই লোলুপতার। পাকসেনারা কেবল ঘটনাস্থলে তাদের পৈশাচিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রতি একশ জনের মধ্যে অন্তত দশ জনকে ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের জন্য। রাতে চলতো আরেক দফা নারকীয়তা। কেউ কেউ হয়ত আশিবারেরও বেশী সংখ্যক ধর্ষিত হয়েছেন! এই পাশবিক নির্যাতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা কল্পনাও করা যাবে না।'

ধর্ষণের শিকার চার লাখ নারী

একাত্তরের নারী নির্যাতনের সঠিক পরিসংখ্যান নেই আমাদের হাতে। তা নিরুপন করাও দুঃসাধ্য। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দু'লক্ষ মা বোন নির্যাতিত হয়েছেন–এমন তথ্য প্রচলিত থাকলেও নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা এর দ্বিগুন হতে পারে। কারো কারো মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতাদের সংখ্যা চার লাখের ওপরে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা ও গর্ভপাত ঘটানোর কাজে নিবেদিত ড. জিওফ্রে ডেভিসের মতে, প্রায় চার লাখ রমণী গর্ভবতী

হয়েছিলেন। ডা. এম এ হাসান পরিচালিত ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির তথ্যানুযায়ী, '৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার নারী ধর্ষিত এবং আরো ১ লাখ ৩১ হাজার হিন্দু নারী স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল বিশাল জনসমুদ্রে।' এদের মধ্যে পাঁচ হাজার নারীর গর্ভপাত সরকারিভাবে ঘটানো হয়েছিল বলে জানান ইন্টারন্যাশনাল প্যানড পেরেন্টহুড প্রতিষ্ঠানের ড. ডেভিস। যুদ্ধের পরপরই তিনি এসব মা ও তাঁদের শিশুদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন তৎকালীন 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই এক লাখ ৫০ হাজার থেকে এক লাখ ৭০ হাজার নারীর ভ্রূণ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে সেভাবে 'নষ্ট' করেছে।

শহর থেকে গ্রাম–সর্বত্র চলে বিভৎসতা

শহর থেকে গ্রাম–সর্বত্রই পাকিস্তানিরা চালিয়েছে বিভৎসতা। পরিসংখ্যানের বাইরে, অগণিত নারী নির্যাতনের শিকার হলেও তা প্রকাশ করেননি লোকলজ্জার ভয়ে। মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারেননি বীরাঙ্গনারা। পরিবারের অসম্মানের কথা ভেবে তাঁরা নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। আবার কেউ কেউ নিজের জীবননাশ করেছেন নীরবে। অনেক বীরাঙ্গনা যেভাবে হারিয়ে গেছেন আমাদের সমাজের অতল অন্ধকারে, তেমনি তাদের উদরে জন্ম নেওয়া শিশুরাও বিলীন হয়ে গেছে পৃথিবীর সুবিশাল ব্যপ্তিতে। যাঁরা নিজেদের আড়াল করতে পারেন নি তাঁরা বয়ে বেড়াচ্ছেন যাতনা।

রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে নির্যাতিত নারীদের চাওয়া-পাওয়ার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু সেসব দুঃখিনীর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। অনেকে ভেবেছিলেন, দেশের জন্য যেহেতু নির্যাতিত হয়েছেন তাঁরা, ললাটে লেগেছে কালিমা, সেই কালিমা মুছতে এগিয়ে আসবে দেশ। মুক্তযুদ্ধ-পরিবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁদের নিজের মেয়ে বলে স্বীকৃতি দিয়ে 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। অনগ্রসর সমাজ সেসব বীরাঙ্গনাকে তাঁর মতো করে আপন করে নিতে পারেনি। বীরাঙ্গনা উপাধি নির্যাতিতাদের সম্মানের বদলে কলঙ্কের তিলক এঁকে দিয়েছে কপালে। বীরাঙ্গনারা যে দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন নির্বাহ করছে তাতে করে একাত্তরের যাতনা ভুলে থাকা তো দূরের কথা, প্রতিনিয়ত সেই যন্ত্রনা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাঁদের।

নির্যাতিতাদের ভাষ্য

একাত্তরে নারী নির্যাতনের যে ঘটনা ঘটেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা দূরহ। কালির আচড়ে তাঁদের ত্যাগ, যন্ত্রনা, নির্যাতনের পুরোপুরি চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব। নির্যাতিতদের মধ্যে হাতেগুনা কয়েকজন ছাড়া অন্যরা এনিয়ে কোনো কথা বলতে চাননা। যারা অকপটে নিজেদের পীড়নের কথা বলেছেন, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, একাত্তরে নারীর প্রতি নৃশংসতার মাত্রা।

খুলনায় নির্যাতি হন ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। পাকি কমান্ডার গুলজারিন, মেজর ইসতিয়াক, মেজর বেলায়েত খান, মেজর একরাম, মেজর জাফর, মেজর বানোরি, ক্যাপ্টেন আকরাম, ক্যপ্টেন গনি, মেজর আব্দুলাহ, কর্নেল

খটক, মেজর জুবলি প্রমুখ আর্মি অফিসার কতৃক ধর্ষণের শিকার হন তিনি। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, 'এপ্রিল থেকে পরবর্তী পাঁচ মাস পর্যন্ত চেনা অচেনা মিলিয়ে প্রতিদিন অন্তত তিনজন করে পাকি সেনা সদস্য তাকে ধর্ষণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন লতিফা। একাত্তরের দুর্বিসহ সময়ে কলেজ হোস্টেলে আটকা পড়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে আটক করে আড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে যায় পাকবাহিনী। তিনি জানান, প্রথমে অফিসাররা এবং পরবর্তীতে সেপাইরা তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকি সেনাদের যখনই ইচ্ছা হত, তখনই তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালাত।

টাঙ্গাইলের ছাব্বিশা গ্রামের ভানু বেগম বলেন, ঘন সবুজ পোশাক পরা আট নয়জন পাকি সেনা তাকে ঘিরে ধরে। বাড়ির ভেতরেই গুলি করে হত্যা করে তাঁর ভাসুরকে। তাঁর স্বামী ইয়াকুব আলী তখন সেখানে ছিলেন না। পাকি আর্মি তাঁর গায়ে হাত দিলে তিনি 'বাবা সোনা, গতরে হাত দিয়েন না' বলে অনেক অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অনুনয় মন গলাতে পারেনি পাকি সেনাদের। তারা তখন বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভয় দেখায় ছেলেকে আগুনে ফেলে দেওয়ার। অবশেষে নিজেকে পাকি বাহিনীর বিকৃত লালশার কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হন ভানু বেগম। যাবার সময় তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগুনে। আজও সে পোড়া দাগ রয়েছে তাঁর হাত, পা ও পিঠে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বরিশালের গৌরনদীর বঙ্কুরা গ্রামের নূরজাহানের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। মুক্তিবাহিনীর জন্য তথ্য সংগ্রহ করতেন তিনি। কিন্তু একদিন তিনি ধরা পড়ে যান পাকিদের হাতে। যদিও প্রাণ বাচাতে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, তবে তাতে সফল হননি। পায়ে গুলি করে তাকে আটক করে হায়নার দল। তিনি জানান, গৌরনদী স্কুলে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিবাহিনীর খবর জানবার জন্য শুরু হয় তার উপর অত্যাচার। হাত পা বেঁধে পুকুরে ফেলে রাখা হত, বেয়নট দিয়ে সারা শরীর খোঁচানো হত। তখনও সাবালিকা হননি নূরজাহান। অথচ তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হত প্রতিদিন অসংখ্যবার। খানসেনাদের লোলুপতার সেই চিহ্ন এখনও তাঁর শরীরে রয়ে গেছে কামরের দাগ হয়ে। নূরজাহান জানান, শারীরিক অত্যাচার যারা করেছে, তারা সবাই পাকিস্তানি সৈন্য।

নাটোরের ফাতেমা জানান, আমার স্বামী ডা. জসীমসহ গ্রামের অনেক পুরুষ সদস্যকে পাকবাহিনী জবাই করে হত্যার পর মহিলাদের ওপর চড়াও হয়। তিনি জানান, আমরা যে ঘরের মধ্যে ছিলাম, সেই ঘরের দড়জা ভেঙে দশ বারো জন পাকিস্তানী আর্মি ও বিহারী ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমরা তখন প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে লাইন করে দাঁড় করাল। তারা আমাদের বুকে বন্দুক ধরল, কিন্তু গুলি করল না। এই দৃশ্য দেখে আমাদের বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এরপর আর্মি বলল যে তাদের কুপ্রস্তাবে রাজী না হলে বাচ্চাদের পা ধরে ছিড়ে ফেলবে। ভয় দেখিয়ে বলে গুলি করব। তখন ওরা যা বলে তাই করতে বাধ্য হয় মেয়েরা।

একাত্তরে বরগুনার জেলে বন্দি ছিলেন রোকেয়া বেগম। বরগুনার জেলহত্যায় তিনি তাঁর স্বামীকে হারান। তিনি

জানান, আমাকে যেখানে রাখা হয়, সেখানে আরও চার পাঁচ শ' মহিলা ছিল। নির্যাতন প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য–পাকিস্তানী মিলিটারি একসাথে ভেতরে ঢুকে যাকে সামনে পেয়েছে তাকে নির্যাতন করেছে। মেয়েদের জড়াজড়ি, ধরাধরি করে নিয়ে যেত। শাড়ি টেনে খুলে ফেলত। মহিলারা কত কান্নকাটি করেছে। তাদের হাতে পায়ে ধরেছে, তবুও রেহাই পায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার তেলিয়া রবিদাসের বয়স ছিল ১৫। সম্প্রদায়গতভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হলেও পাকিরা লালশা মেটাতে পিছপা হয়নি। তেলিয়ার ভাষ্য অনুযায়ি, একদিন দুপুরে এসে ঝড়ের বেগে বাড়িতে প্রবেশ করল একদল পাকপশু। ওরা ছিল চারজন। আমাদের ঘরে মাত্র দুইটি রুম ছিল। একটিতে পরিবারের সবাইকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল এটে দেয় তারা। আমাকে ধরে নিয়ে যায় পাশের কক্ষে। এরপর একজন একজন করে ৪ জন তাদের লালশা মেটায়। তাদের বাধা দেওয়ার শক্তি আমার ছিলনা। অস্ত্র দেখে আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারা আমাকে বলেছিল–চিৎকার দিলে, মৃত্যু দেবে। আমি মৃত্যু ভয়ে ছিলাম। পাখন্ডতা শেষে তারা চলে যায়। আমরাও বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পাড়ি জমাই।

এখনো কাটেনি আধার

এক ধরনের আধারের বৃত্তে বন্দি হয়ে আছেন বীরাঙ্গনারা। একাত্তরে তাদের ওপর নেমে আসা নিপীড়নের ক্ষত আজও শুকায়নি। স্বাভাবিক হয়নি হায়েনাদের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া নারীদের জীবন, সংসার। সমাজের একটি শ্রেণীর অসুস্থ মানসিকতা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে রেখেছে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপ আর কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন বীরাঙ্গনারা। কাউকে 'পাঞ্জাবীর বউ', কাউকে 'নষ্ঠা' বলে নির্যাতন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যেখানে এসব নারীদের সহানুভূতি পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে স্বজাতিয়দের এমন আচরণ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন করছে নির্যাতিতাদের। আর সংসারের কাছ থেকে উপেক্ষা জীবনমৃত করে রেখেছে তাঁদের

অপূর্ব শর্মা : মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক যুগভেরী

দেওয়ান হাসন রাজার ছেলেবেলা ও তাঁর শিক্ষা জীবন

সামারীন দেওয়ান

হাসন রাজা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ছিল না এমনকি বাংলা পড়ালেখাও ছিল দু:সাধ্য। তখন অবস্থাপন্ন মুসলিম সমাজে আরবি, ফারসি শিক্ষার রেওয়াজ ছিল। নিজবাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে পারিবারিক ঐতিহ্যস্বরূপ হাসন রাজা তার প্রাথমিক জীবনে ফার্‌সি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। সৈয়দপুর নিবাসী আদম খাঁ নামে এক মৌলবি সাহেব ছিলেন আরবি বোগদাদী কায়দা এবং কুরআনুল-করিম পাঠের শিক্ষক। সাথে সাথে ফারসি ও উর্দু শিক্ষারও সুযোগ ছিল। বাংলা শিক্ষার জন্যে একজন পন্ডিতও ছিলেন। ছেলেবেলায় তার বাবা তাকে সিলেটের একটি মাদ্রাসায় প্রথমেই কিছু প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়ার জন্যে সিলেট শহরে পাঠিয়েছিলেন। যে মাদ্রাশায় হাসন রাজা মাত্র তিনটি বছর তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু ও ইতি টানলেন, তার নাম ছিলো সাইদিয়া মাদ্রাশা। এখানে তিন বছর কাটানোর পর মায়ের নির্দেশে তিনি লক্ষনশ্রীর ঘরে ফিরে আসলেন।

সুরমা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে হাসন রাজা বেড়ে উঠেন। জন্মের পর থেকেই একমাত্র শিশুপুত্রকে মা হুরমতজান বিবি যক্ষের ধনের মত আগলিয়ে রাখতেন। চারপাশে লোকে লোকারন্য ভরা হাসন রাজার বাল্যকালটি ছিল ছবির মত রঙিন। বাড়িভরা পরিচারক পরিচারিকার মধ্যে শিশুকালটি ছিল উৎসবমোখর। একদিন হুরমতজাহান বিবি ঘরে বসে কাজের মহিলা সোনার মা-কে ডাকলেন। আদেশ হলো 'আমার হাসনকে সুরমাপারে খোলা বাতাস খাইয়ে আন্।' তিনি ভাবলেন এই বদ্ধ পরিবেশে হাসন বোধ হয় হাঁপিয়ে উঠেছে। চার বছরের শিশু হাসন রাজার খোলা হাওয়ার স্পর্শে প্রাণটা জুড়ালো। পরবর্তীকালে হাসন রাজা তার নিত্য সহচর 'উদাই' জমাদারের কাছে স্মৃতি-চারণ করেছেন এই বলে যেদিন তিনি প্রথম সুরমার পারে দাঁড়িয়েছিলেন, তার কাছে সেদিনের আবছা জগতটা ছিল যেন এক বিশালকায় দুনিয়া। প্রকৃতির সাথে হাসন রাজার এই প্রথম পরিচয়। দিগন্ত-বিস্তৃত এক অপূর্ব আলোর ছোয়াছ যেনো তার চোখেমুখে এসে ঠেকে। সুরমা জলরাশি ছুয়ে যেন উত্তর-পশ্চিম দিগন্ত বরাবর হেলান দেয়া খাসিয়া পাহাড় অবাক করলো বালক হাসন রাজাকে। চেয়ে রইলেন সেই দূরের প্রান্ত ছুঁয়া নীল পাহাড়ের দিকে। শিশুকালেই সুনাম-

গঞ্জের মাটি, মানুষ আর প্রকৃতি এই তিন মিলে শিশু হাসন রাজার চিন্তা চেতনা, ভাবনা, ভাষা আর আঞ্চলিক শব্দচয়ে-নর মানসপটটি তৈরি করেছিলো। এর পরপরই কৈশোরকালে তার মধ্যে একটি কাব্য সম্মিলন ঘটে। 'সৌখিন বাহার' কাব্যের গাথুনি শুরু হয় সেই সময় থেকে। মাত্র ছয় কি সাত বয়সে বোন সহিফা বানুর নৈকট্য লাভ করেন হাসন রাজা। সিলেটে সাঈদিয়া মাদ্রাসায় বছর তিনেক পড়ালেখার পর সুনামগঞ্জে আবার ফিরে আসেন। প্রায় সমবয়সী সহোদর মুজাফ্ফার রাজা ও বোন সহিফা বানু হয়ে থাকেন ছেলেবেলার সঙ্গী। কিন্তু প্রায়ই তিনি গর্ভ ভরে সকলকে বলতেন বিশেষকরে নারী সম্প্রদায়কে যে, যদি মহিলা শিক্ষিতজনকে দেখতে চাও তাইলে সিলেটে আমার বোন সহিফা বানুকে দেখে এসো। মাত্র সেভেন পাশ সহিফা বানুকে তিনি মহা শিক্ষিত মনে করতেন এবং নারী শিক্ষার একটি সুন্দর উদাহরন স্বরুপ তাঁর বৈমাত্রিক বোন সহিফা বানুর পক্ষে তাঁর জোড়ালো অভিমত থাকতো।

হাসন রাজার বয়স তখন আট কি নয়। বাবা আলী রাজা রামপাশার জমিদারী সহায়-সম্পত্তি তদারকি করার লক্ষে বছরের মাস আটেক পর্যন্ত রামপাশায় অবস্থান করতে শুরু করলেন। শৈশবে বাবার উপস্থিতির অভাব সত্ত্বেও অন্দরমহলের চারপাশ আলোকিত করেছিলেন তার মা। ঘরের বাইরে প্রকৃতিপ্রেমী বালক হাসন চষে বেড়াতে থাকেন বন বাদার, হাওর জঙ্গল, নদী নালা আর খাল বিল। সুনামগঞ্জের অনাবিল প্রকৃতি, আর কুড়া, দোয়েল, ময়না, সারস, মুনিয়া, টিয়া তাঁর চতুষ্পার্শে। দশটি গ্রাম্য খেলার সাথীদের সঙ্গে সহজিয়া জীবনের সুত্রপাত এসময়ই। দলবেধে খোলা আকাশের নীচে দৌড়ঝাপ, দিঘীর পানিতে সাঁতার কাটা, ভেলায় চড়ে নদীতে ভেসে বেড়ানো, ঘুড়ি উড়ান, লুকোচুরি ইত্যাতিতে তাঁর আনন্দের সীমা নেই।

বাবার সঙ্গে রামপাশায় গেলে পর বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে গ্রাম ঘুরে বেড়ানো, কখনো বা কাপনা নদীর পাড়ে। রঙিন গানে-আনন্দে, কোলাহলে মুখরিত রামপাশা । সংগীতের সাথে এই প্রথম তাঁর পরিচয়।

হাসন রাজার ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে। গ্রামবাসীর সুখ দুঃখ হাসি কান্নার সাথে সবসময়ই তিনি জড়িয়েছিলেন। আর সেজন্যেই গ্রামের প্রতি তার বিশেষ মায়া। সচরাচর আর দশজন জমিদারের ন্যায় অনায়াশে নিজের জন্যে লখনউ, কলকাতা, ঢাকা কিংবা সিলেট শহরে তার ঘরবাড়ি থাকতে পারত। কিন্তু শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে আরাম আয়াশ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সাদামাটা লক্ষণশ্রী গ্রাম/কিংবা পরগনা ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে হলো না তাঁর কোনদিনই।

ছেলেবেলায় একবার তাঁর কুস্তিখেলা দেখার সুযোগ হয়, আর আরেকবার শুনেন ঘাটুগান। এই দুটো জিনিসই হাসন রাজার বড় অপছন্দের। এগুলো দেখলেই তার মেজাজ মর্জি খারাপ হয়ে উঠতো। এতে কেমন যেনো একটি কৃত্রিমতা আর ভান্ডামি লুকিয়ে রয়েছে। এই সময় একদিন হাসন রাজা তাঁর মায়ের এক কষ্টের কথা জানলেন। বিষয়টি সরাসরি মায়ের মুখ থেকেই জেনেছেন তিনি। তাঁর বাবার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেই মা ছিলেন লক্ষণশ্রী পরগনার জমিদার আমির বকস চৌধুরীর স্ত্রী। সুদুর নেত্রকোনার কালিয়াজুড়ি থেকে বিয়ে হয়ে এসে হুরমত জাহান বানু সুখে শান্তিতে তাঁর স্বামীর ঘরসংসার করে যাচ্ছিলেন। সুখের নৌকোয় জন্ম নেয়া একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে

নিয়ে স্বামী স্ত্রীর ঘর ছিলো আলোকিত। সেই সুখের সংসারে একদিন আসলো একটি বড় ঝড়। তছনছ করে নিয়ে গেল তাঁদের সমস্ত সুখ শান্তি।

শুনেন সে কাহিনী। আমির বক্স ছিলেন একজন ধর্মপ্রান ব্যক্তি। পির ফকির আওলিয়া বুজুর্গে ছিলো তার অগাধ আস্থা। তাই যখনই কোন পির ফকিরের নাগাল পেতেন, তখনই তাকে আকড়িয়ে ধরতেন। ছাড়তে চাইতেন না। তার বাড়িটি ছিল অথিতিশালার মত। অতিশয় অতিথিপরায়ন আমির বক্স চৌধুরী তার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের মাথার উপর খাসার খাঞ্চা তুলে নিজের হাতে চামচ নিয়ে অতিথি মুসাফেরগণকে খাবার বেটে দিতেন। সেখানে হিন্দুস্থানী ফকিরগণসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে পির ফকির আথিত্য গ্রহণ করতেন। সেই সময় কত যে তাঁরা বিদায়ের অথিতি-উপঢৌকনও নিয়ে যেতেন তার কোনো শেষ ছিল না। এই ধারায় কোন কোন পির ফকির সুনামগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নজীরও পাওয়া যেতো। এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিম পাড়াস্থ পির ফকির গুষ্টির বসতি স্থাপন গড়ে উঠতে দেখি। প্রায় দুই শত বছরের কালের আবর্তনের পরও আজো সুনামগঞ্জ শহরে পির ফকিরের যথেষ্ট বংশধরের অস্থিত্ব খুজে পাওয়া যায়।

যাই হোক একদিন এক হিন্দুস্থানী ফকির উপঢৌকন না নিয়ে জিদ ধরে বসে পড়লেন যে, আমির বক্সে চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের চুয়াড়ি তাজি ঘোড়াটি সে নিয়ে যাবে। তিনি ফকিরকে জানালেন তাঁর বড় ছেলে সখ করে এই ঘোড়াটি কিনে-ছিলো, সাদা রঙের এই তাজি ঘোড়াটি ছেলের অত্যন্ত সখের, তাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। ফকির জানাল, এই ঘোড়া না দিলে তাঁর আর চাওয়ার থাকবে না, সে অন্য কিছুই চায়না। এমনি অবস্থায় বাড়ীর ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করায় হুরমতজাহান বিবি ছেলের এত সখের ঘোড়াটি না দিয়ে ঘোড়ার সমান মূল্য টাকা দিয়ে ফকিরকে সন্তুষ্ট করে দিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু ফকির জানালো, সে ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নেবে না। আমির বক্স তাঁর পায়ে ধরে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করার পরও ফকির কিছুই না শুনে চলে গেল।

এই হিন্দুস্থানী ফকিরের প্রস্থানের কিছুদিন পরই আমির বক্স চৌধুরীর তিন ছেলে, যথাক্রমে সিকান্দর বক্ত, রেজওয়ান বক্ত, সৈইদ বক্ত এবং এক কন্যা সওয়ারী বানু বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথে যাত্রা করে। আমীর বক্স চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এর কিছুদিন পর তাদের ঘরানা পির হারুলিয়ার পিরসাব মওলানা সৈয়দ আরজদ আলী সাহেব তেঘরিয়ার সাহেববাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগালেন। ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর পরপর আরজদ আলী পিরসাব এক শুনা কথায় কান দিলেন। জানলেন, আমির বক্স চৌধুরী এক হিন্দুস্থানী ফকিরের মুরিদ হয়েছেন, তখনই তিনি রাগান্বিত হয়ে নৌকার মাঝিকে আদেশ করলেন এই বলে যে, এক্ষুনি আটকুঁড়ের (নির্বংশ) বাড়ীর ঘাট হতে নৌকা ছাড়ার জন্যে। এই কথা চৌধুরী সাহেব যখন অন্য লোক মারফৎ শুনলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন, আমার ঘরের পিরসাব যদি এই কথা বলেন, তাহলে আল্লাহ যেনো তাঁকেও নির্বংশ করেন। এরপর আমির বক্স আর বেশী দিন বাঁচেননি, তাঁর চার সন্তানকে অনুসরন করে তিনি নিজেও পরলোকে পাড়ি জমান। আর

অন্যদিকে, হারুলিয়া পিরেরও একমাত্র পুত্র কোনো এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। নিজের কোন বংশ না থাকায় সৈয়দ মুহম্মদ আরজদ আলী পিরসাব তাঁর ভাগ্নে সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ওরফে কনু মিয়াকে পালক-পুত্র করে রাখেন। বর্তমান হারুলিয়ার সৈয়দ বংশধরগন ঐ ভাগ্নের বংশধর। হাসন রাজার জেষ্ঠ্য পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজার বিবৃত উপরের দুটি ঘটনা থেকে অনেকটা আঁচ করা যায় যে তিনি তাঁর পিতামহি হুরমতজাহান বিবির স্বামীহারা, পরবর্তীকালে তাঁর স্বামীর খালাত ভাই আলী রাজার সাথে বিবাহবন্ধন এবং পিতা হাসন রাজার জন্মের সাথে যেনো এর একটি অ'লক্ষনীয় অমোঘ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলে ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছেন। হাসন রাজা যখন তার ১৩/১৪ বছর বয়সে সে কথা জানলেন, মায়ের কষ্টটির কথা তার বুকের মাঝে গিয়ে এক বাসা বাধলো। ধারন করলেন সেই ব্যাথাটি তার গভীর মনের অতলে।

এরমধ্যে সুনামগঞ্জের অনাবিল প্রকৃতি আর মানুষের সাথে মিলেমিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন হাসন রাজা। এসময় কুড়া পাখির সাথে হাসন রাজার মনটা ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। গনিউর রাজা বর্ণীত হাসন রাজার কুড়া শিকাড়ের অসংখ্য জায়গার নাম জানা যায়। শুধুমাত্র লাউড় অঞ্চলে ৩৪টি স্থানের নাম এবং সিলেটে ১৬টি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। ঠিক তেমনি সিলেটের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার বিশ্বনাথ এলাকায় অসংখ্য স্থানে তাঁর বিচরন ঘটেছে।

বছরের দুই ঈদ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহার দিনে বালক ও যুবক হাসন রাজা কেবল নিজের রঙিন জামা পরিধান নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না, পাড়া প্রতিবেশী ও গরীব লোকের মাঝে রঙিন কাপড় বিতরণে, পিঠা সন্দেশ উপভোগে এবং মানুষের কুশল জানতে তাঁর ছিল অফুরন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি। ঈদে মিলাদুন্নবীতে ঘরে ঘরে মিলাদ ও নাথ গানের আসরে সুফি সুরভান্ডারের স্বাধ নিতেন তিনি। ঠিক বিপরীতে বিষাদময় মোহার্‌রম উদযাপন তরুণ ভাবুক হাসন রাজাকে উদাসীন করে রাখতো।সুনামগঞ্জে বাবা আলী রাজার নানার বাড়ি [মা দৌলতজাহান বিবি], তেমনি দাদা আনোয়ার খানের [মা সহরজাহান বিবি] নানার বাড়িও সুনামগঞ্জে। হুরমত জাহান বিবিকে বিয়ে করার ফলে এই সুনামগঞ্জেই আলী রাজার ওরশে জন্ম নেন হাসন রাজা। মুর্শিদাবাদ থেকে আগত সেনাপতি অয়েজ উদ্দীন কোরেশীর বোন সহর জাহান বিবি। আর সেনাপতির দুই কন্যা সবর জাহান বিবি এবং দৌলত জাহান বিবি। মুর্শিদাবাদের নওয়াবরা ছিলেন শিয়া মতালম্বী। মুর্শিদাবাদ থেকে আগত সেনাপতিগণও ছিলেন ওই মতাবলম্বী। সুনামগঞ্জের তখনকার সীমান্ত রক্ষক সেনাপতি অয়েজ উদ্দীন কোরেশী [আলী রাজার মাতামহ] ও তার উত্তর পুরুষগণ এবং স্থলাভি-সিক্ত সেনাপতি মির্জা মুরাদ বেগের সময়েও বাড়িতে বাড়িতে মহা ধুমধামের সাথে মুহরম পালিত হত। মুহররম উপলক্ষে তাজিয়া বের করা হত। পরবর্তীতে বহু বছর যাবত এই রেওয়াজ এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তাজিয়া পর্ব বন্ধ হবার পরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো তরুণ হাসন রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এসবে তিনি এক বিশেষ আনন্দ-আমেজ উপভোগ করতেন।

সেকালে সুনামগঞ্জ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায় ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। শহরজুড়ে প্রতি বছর পূর্ণোদ্যমে

পুজাপার্বণ পালিত হত। এসব অনুষ্ঠানে হাসন রাজা কৌতুহলী মন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। লক্ষ্মীপুজা, স্বরস্বতীপুজা, কালীপুজা ও দূর্গাপুজায় হাসন রাজা প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন। পুজার মাঙ্গলীক দিকগুলা এই সময় তার কাছে উন্মোচিত হয়।

হাসন রাজার কাছে রথযাত্রার বিশেষ এক আকর্ষণ ছিল। শহর এলাকা ঘুরে রথযাত্রা যখন পশ্চিম বাজার এসে উপস্থিত হত তখন রেওয়াজ অনুযায়ী ঐ বিশেষ স্থানে লোকবাদ্যযন্ত্রের মহড়া বসত। সেখানে তিনি অসংখ্য লোকজনসহ উপস্থিত হতেন এবং এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হতো। জগন্নাথ পার্বণের এই ধুমধামের রথযাত্রা এক রঙিন লোকারণ্যে তার চোখে অপূর্ব ঠেকতো। মানুষের সুর কলধ্বনিতে হাসন রাজার মন মেতে উঠত। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্বরণে প্রতি বছর চাকা বিশিষ্ট রথে দেবতাদের উপাসনাপর্ব চিত্তাকর্ষক। বসন্তের ফাগুনে রঙের মাখামাখিতে হাসন মন যখন আনন্দে নেচে উঠত, সে-সব উৎসবে তখন তিনি উপস্থিত হলে পর এক পরিশীলিত পরিবেশে কৃষ্ণলীলার হুলিখেলা তার মনকে কেড়ে নিত। হিন্দু মুসলিম সবার জন্য আনন্দের বন্যা বয়ে আসতো, প্রাণজুড়ানো গানের ডালি নিয়ে আসতো একদল গায়ক গায়িকা। বসন্তের আগমনে বাজারের ব্যবসায়ী ধনী মহাজন হাসন রাজার পা থেকে কোমর পর্যন্ত আবীর ছড়িয়ে দিতেন। এরপর পরস্পরের প্রতি ছুড়াছুড়ি করত আবীরের পিচকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে হলি গানে সমস্ত এলাকা মুখরিত হয়ে উঠত–

আজি ফাগুন ওরে
এই মধুর লগন
মন ময়ুরী নাচে
জাগে ত্রিভূবন
খেলে হুলি কোমল-লোচন।
গুঞ্জরে ভোমরায়
ফাগুন ওরে গীত গায়
মৌপিয়া পক্ষিয়ে করতল বায়
ফুলফলে মধুর গুঞ্জন
নাচি উঠে বন উপবন।
খেলে কমল-লোচন।

অথবা–

লাল সরোবর লাল
হইয়াছে আবিরে,
ছি ছি লাজে মরিরে।

এই সময় ঢোল, ঢাকি, বাঁশি, কাসি, সারেঙ্গির সুরধ্বনি, রঙিন পোষাকের সমারোহ আর নানান রঙের ছুড়াছুড়িতে হাসন রাজার জগতটা যেন রঙিন হয়ে উঠত। আত্মহারা হয়ে যেতেন কৃষ্ণলীলায়।

তার মা চেয়েছিলেন, জমিদারী পরিচালনার দলিলপত্রাদি বিষয়ে দ্রুত জ্ঞান আহরণ করা। তাই মাদ্রাসায় লেখাপড়ার বছর তিনেক পরই আবার তিনি সুনামগঞ্জে ফিরে আসেন। তিন চার বছরের মাদ্রাসা শিক্ষার পর তার জন্যে পড়াি-লখার অতৃপ্তিই রয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

এতদসত্ত্বেও অল্প বয়সে তিনি কবিতা ও গান লেখার মধ্য দিয়ে কাব্যসৃষ্টি শুরু করেন। বিশেষত পাখি পশু ও মানুষকে নিয়ে তিনি ত্রিপদী ছড়া তার সৌখিন বাহার নামক গ্রন্থে রচনা করেন। তার সম্পর্কে যে ক'জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তারমধ্যে তারই কনিষ্ট পুত্র আফতাবুর রাজার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'আমি আমার পিতা-সাহেবকে তাঁহার ৫০ হইতে ৬৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাছ থেকে দেখিয়াছি। তিনি ঘরে বসিয়া বইপত্র পড়িতে অভ্যস্থ ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ৬০ বছর বয়সে একদিন আমার নজরে আসিল তিনি কলকাতারই প্রকাশিত একটি বাংলা খবরের কাগজ পড়িতেছেন। এখন স্মরণে আসিতেছে যে, পত্রিকাটি নাম ছিল 'বন্দে-মাতরম'।'

বাংলাদেশের ঊনিশ শতকের শেষভাগের একজন স্বনামধন্য লেখক ও ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তজা আলী লিখেছিলেন, 'হাসন রাজা ছিলেন স্বভাব কবি। নশ্বর জগতের ভোগ-বিলাসের উর্ধ্বে ছিল তার দৃষ্টি। বিষয় বৈভবের মধ্যে থেকেও তিনি অনেকটা নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করে গেছেন'।

হাসন রাজার জীবনে শিক্ষাকে ঘিরে তার চিন্তা, ধ্যান-ধারণা কিংবা প্রেরণার উর্দ্ধে তাঁর মরমি কবি-খ্যাতি আর তাঁর সুনাম উপছিয়ে ওঠে। শিক্ষার অভাব অনুভব থাকা সত্ত্বেও 'প্রথম থেকেই তার একটি নিমগ্ন ও নির্মোহ কবিচিত্ত ছিল, যার আলিঙ্গনে সমস্ত রস তার হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছে এবং বিবর্ণ হয়েছে তার পরিমন্ডল।' এ প্রসঙ্গে কলকাতার লেখক অমিয়শঙ্কর চৌধুরী লেখেন, 'তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুযোগ মোটেই পাননি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যে সবারই অবশ্য কর্তব্য তা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন।' আবু আলী সাজ্জাদ হোসেইন লেখেন '১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার পরপরই মরমী কবি হাসন রাজা কর্তৃক সুনামগঞ্জে হাসন এম.ই. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনৈক প্রমদা রঞ্জন আচার্যকে ঢাকা থেকে এ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক করে আনা হয়।' এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় হাসন রাজা জায়গা ও অর্থ সরবরাহ করেন। ৯ বছর স্কুলটি চলার পর ১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহনের পঞ্চাশ বছরপূর্তী উপলক্ষে গোল্ডেন জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ঐ সময় সিলেটের প্রথম ডেপুটি কমিশনার মি. এ.এল. ক্লে হাসন রাজাকে অনুরোধ করে তার প্রতিষ্ঠিত হাসন মিডিল ইংলিশ স্কুলটির উপর একটি পরিপূর্ণ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাঠান। হাসন রাজা এতে রাজি হলে 'সুনামগঞ্জে এ উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। জুবিলী উৎসব চিরদিন স্মরণ রাখার জন্যেই সুনামগঞ্জে জুবিলী হাইস্কুল স্থাপন করা হয়।'

কলকাতার লেখক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন– 'সুনামগঞ্জের জুবিলী হাই স্কুলের নতুন বাড়ি তৈরির জন্যেও তিনি বিস্তর জমি দান করেছিলেন।' এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তার মাইনর স্কুলটিকেই জুবিলী হাই স্কুলে উন্নিতকরণে হাসন

রাজার অবদান ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত 'সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুল' এর পিছনে যে মূলতঃ হাসন রাজার শিক্ষা প্রসারের একটি তীব্র অভিপ্রায় জড়িত ছিল তা স্পষ্টত বুঝা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে জুবিলী স্কুলের ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজকরা এ স্কুলের সাথে হাসন রাজা জড়িত থাকার প্রসঙ্গটি একেবারে এড়িয়ে যান। কোন হীনমন্যতার কারনে নিজেদের গর্বিত ইতিহাস ঐতিহ্যকে অসম্মান করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়।

বিলেতি আমেরিকান গবেষক এডওয়ার্ড ইয়াজজিয়ান বলেন 'After reading Hasan Raja's songs, I was left wondering where a barely literate person absorbed such sophisticated philosophical ideas. Knowledge of this sort is usually obtained by a combination of learning from a teacher (guru/murshid), book knowledge, and personal realization.' আর এজন্য বলতে হয় হাসন রাজার দার্শনিক ও শিক্ষা অর্জন বিষয়ক চিন্তাধারার পিছনে যে স্পৃহা গভীরভাবে কাজ করেছিল তার সাক্ষর সুস্পষ্টভাবে জুবিলী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে রয়েছে। হাসন রাজার হাত ধরে সুনামগঞ্জে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নতুন যুগের সূচনা হলো। হাসন রাজার ভাবনা ছিল– এলাকার মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাক। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল বলেই হাসন রাজা পারিবারিক জীবনে নিজ পুত্রগণ এবং ভাতিজাদেরকে পড়াশোনা করানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম ভাতিজা আবুল হোসেইন, দ্বিতীয় ভাতিজা আজিজুর রাজা এবং নিজ দ্বিতীয় পুত্র হাসিনুর রাজাকে কলকাতা ইটালি মুল্লা পাড়াস্থ হাই কোর্টের উকিল নূর উদ্দিনের শশুরের বাড়িতে রেখে পড়াশোনার করানোর উদ্দেশ্যে তিনি এদেরকে পাঠিয়েছিলেন । ১৮৮৬ সালে নিজ পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজাকে তিনি সিলেট দরগা মহল্লায় গভর্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দিন। বোন সঈফা বানুর তত্ত্বাবধানে থেকে কুয়ার পারের বাসায় থেকে তিনি কয়েক বছর সিলেটে তিনি লেখাপড়া চালান। গনিউর রাজাকে ১৪ বছর বয়সে ঢাকায় পাঠানো হয় পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। এতে খুবই স্পষ্ট বুঝা যায় যে হাসন রাজা নিজে পড়ালেখা না করলেও তার বংশধরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলার একটি প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল।পরিবারের বাইরে হাসন রাজা অসংখ্য স্থানীয় ছেলেমেয়ের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যান। এক্ষেত্রে মুসলিম ও মুমিনের নাম বহু লেখকের লেখায় উল্লিখিত রয়েছে।

হাসন রাজা তাঁর সহজিয়া জীবনের সবচাইতে দু:খজনক দিক হলো বার বার তাঁর আপনজনের মতো মানুষগন, যেমন স্ত্রীগন বিয়ের পরপর বছর তিন কি চার এর মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের অতি অল্পকালে মারা যেতেন। এইভাবে পরপারে ছয়জন স্ত্রীকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ট স্ত্রী লবজান চৌধুরীকে হাসন রাজা নব-স্ত্রী হিসেবে ঘরে নিয়ে আসলেন। তাঁর থেকে অর্ধেকের চাইতের কমবয়স্ক লবজান চৌধুরীকে বিয়ে করে দীর্ঘ ২৭ বছরের সুখের জীবনকাল কাটাতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ এই সহবাস এবং সান্নিধ্যের কারনেই লবজান চৌধুরী তাঁর গর্ভে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং তাঁরই যে সমস্ত বংশধরগন পরম্পরায় জন্ম গ্রহন করেছিলেন তাঁদেরই অনেকে এখন পর্যন্ত হাসন রাজার জন্ম-ভিটেতে

বসবাস করছেন এবং তাঁরাই তাঁর জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। লেখক আমি নিজেও এই লবজান চৌধুরীরই বংশপরম্পরায় চতুর্থ বংশধরপুরুষ । এই গুনসম্পন্না মহিলা তাঁর খ্যাতিপূর্ন স্বামী হাসন রাজার এতখানি অন্তরের মানুষ ছিলেন যে তাঁকে অফুরন্ত সেবা-সুশ্রসা দান করতে জীবনে এতটুকু কার্পন্য করেননি। হাসন রাজাও শেষের স্ত্রীকে শেষদিন পর্যন্ত খুব ভালবাসতেন এবং দোয়া করতেন। ইহকালে পাড়ি দেয়ার আগ পর্যন্ত লবজান চৌধুরানির সেবাদান ও ভালোবাসার ছোয়াছে তিনি স্বস্থি ও শান্তি পেতেন। সে কারনেই শেষ নিঃশাস্ব ত্যাগ করার আগে তাঁর কনিষ্ট পুত্র আপ্তাবুর রাজা চৌধুরীকে হাসন রাজা আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মা লবজান চৌধুরীর নামে যেনো একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে। নারী শিক্ষার গুরুত্ব হাসন রাজার কাছে এতখানি ছিলো যে সে কারনেই হয়তো ছেলে আপ্তাবুর রাজাকে এই উপরোক্ত নসিয়তটি দিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলটির জন্যে জায়গাটি বরাদ্ধ করে যান আপ্তাবুর রাজা এবং তস্য পুত্র অর্থাৎ হাসন রাজার নাতি দেওয়ান আনোয়ার রাজা এই স্কুলটি প্রতিষ্টা করেন ১৯৪৩ সালে। এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শরাফত আলী মাস্টার সাহেব এবং পরবর্তীকালে এই স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আরেকজন প্রধান শিক্ষক হিসাবে মোকার্‌রম আলী পিরেরও অবদানও কম ছিলো না। সম্প্রতি আনোয়ার রাজার প্রথম পুত্র দেওয়ান সামছুল আবেদীন অত্র স্কুলের কমিটি সভাপতি হিসেবে দাবী করছেন তিনিই লবজান হাই স্কুলের প্রতিষ্টাতা। আমি এই প্রবন্ধের লেখক হিসেবে আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হলাম যে স্কুলটি আসলেই ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্টিত হয়েছিলো। এখন আমার প্রশ্নটি হলো আমার বড় ভাই দেওয়ান সামছুল আবেদীন সাবেক এমপি সাহেবের জন্ম যদি হয়ে থাকে ১৯৪৪ সালে, তাহলে কি করে তিনি জন্মের ঠিক এক বছর আগেই প্রতিষ্টাতা সভাপতি হয়ে দাড়ান। পিতার অবদানকে কি খাটো করার জন্যে ?তবে সত্যের মহাসত্যটি হলো এখনো সুনামগঞ্জ এলাকায় প্রতিষ্টিত 'লবজান চৌধুরী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে' লবজান চৌধুরীকে এবং পরোক্ষভাবে হাসন রাজাকে অমর করে রেখেছে। শিক্ষার প্রতি হাসন রাজার অগাধ এক শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। ১৯১৯ সালের দিকে হাসন রাজা তাঁর পুত্রগনকে এই অসিয়ত করে যেতে ভুলেন নি যে শিক্ষা প্রসারেও যা যা করনীয় সবকিছু যেনো পুত্রগন ও বংশধরগন করে যান। ব্রিটিশ নির্মিত টাউন হলের ভিতর ব্রিটিশ-রাজ আমলের পরবর্তীকালে বেসরকারীভাবে সুনামগঞ্জ কলেজ প্রথম গড়ে উঠে। এরপর ১৯৬২ সনে হাসনরাজার নাতি দেওয়ান আনোয়ার রাজার দানকৃত জায়গাটিতে সেটি স্থানান্তরিত হয়। সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ প্রসঙ্গে সাংবাদিক মকবুল হোসাইন চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান সুনামগঞ্জের স্বনামধন্য উকিল ও সাংবাদিক হোসেন তৌফিক চৌধুরী জানান, 'আমার ছাত্রজীবনে কলেজের লেখাপড়া যখন শুরু করি তখন স্থানান্তরিত বর্তমান হাসননগর-স্থিত সুনামগঞ্জ কলেজের আমি ছিলাম প্রথম ব্যাচের ছাত্র। কলেজে আমাদের ব্যাচটির ভর্তি-পর্ব শেষ হয়েছিল সুনামগঞ্জ শহরের মধ্যখানে অবস্থিত কলেজের পুরানো বিল্ডিং এ। স্থানান্তরের পর আমরা ১৯৬১ সনের ২৮ অগাষ্টে হাসন নগরে নতুন তৈরি কলেজ স্থিতিস্থলে ক্লাস শুরু করি। আমার মনে পড়ে এর আগে সুলতানপুর মৌজার হাসননগর এলাকার এই জায়গাটিতে হাসন রাজার নির্দেশ-অনুযায়ী তার কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান আপ্তাবুর রাজার প্রতিশ্রুতি পালনে তারই

পুত্র (হাসন রাজার পৌত্র) দেওয়ান আনোয়ার রাজা আনুষ্টানিকভাবে তখনকার সময়ের সুখ্যাত এস.ডি.ও নিজাম সাহেবের কাছে পুরো ১৪ কেয়ার (৪.৫০ একর) জায়গা সুনামগঞ্জ কলেজের নামে হস্থান্তর করে দেন।
সেই হস্থান্তর অনুষ্ঠানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম'। এর প্রমাণ মেলে দেওয়ান আনোয়ার রাজার রোজনামচায়। তিনি জানান, 'বাবার এই প্রতিশ্রুতি আমি সম্পাদন করি, কেননা তাঁহার বাবা দেওয়ান হাসন রাজার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে সুনামগঞ্জে শিক্ষা বিস্তারে জায়গা-সম্পদ এবং অর্থ দিতে যেনো পরিবারের কেউ কার্পন্য না করেন। দাদার এই শিক্ষানুরাগটি আমাকেও সবসময়ই তাড়না করিয়াছে। কিভাবে এই এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দেওয়া যায়'।
১৯৬২ সনে কলেজের দ্বিতীয় ব্যাচে পড়াশুনা করেছেন বাংলাদেশের সুবিখ্যাত সাংবাদিক কমনওয়েল্‌থ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি হাসান শাহরিয়ার এবং আমার সহোদর প্রাক্তন পার্লাম্যান্ট মেম্বার দেওয়ান শামছুল আবেদীন। তাদের কাছ থেকেও উপরের অনুরূপ তথ্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যদিকে আমেরিকান লেখক ও গবেষক এডওয়ার্ড ইয়াজাজিয়ান তাঁর গ্রন্থে হাসন রাজার কথা লিখতে গিয়ে বলেন যে 'In his later years he regretted his lack of schooling and donated quite a bit of his wealth for the education of those who could not afford it. He also supported the education of women which for that time and place was unusual. 'হাসন রাজার শেষ বয়সে তার স্কুলজীবনের অভাব ভেবে দুঃখ প্রকাশ করেন, আর সেজন্যে এতবেশি আর্থিক অনুদান তিনি শিক্ষাপ্রসারে দিতে পেরেছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারে তার অবদানের কথা তখনকার সময়ের জন্যে সত্যিই অস্বাভাবিক'। হাসন রাজা প্রায়ই খুব গর্বভরে শিক্ষিত নারী, সম্মানিত নারী হিসাবে তার বোন সঈফা বানুকে স্মরণ করতেন।
১৯২০ সনে হাসন রাজা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় চিকিৎসার আশায় তিনি সিলেট সফরকালে অবস্থান নিয়েছিলেন শেখ ঘাটের সেই কুয়ারপারের বাড়ি, তাঁর একমাত্র বোনের স্মৃতিবিজরিত আবাসস্থলে। এই সময় বাড়িটি ছিল তার তৃতীয় পুত্র একলিমুর রাজার তত্ত্বাবধানে।
আর সেজন্যেই সৈয়দ মুর্তাজা আলী নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন যে ঐ বাসা বাড়িটিতেই যখন হাসন রাজাকে দেখতে যান, এবং কবির কাছে এম,সি কলেজ লাইব্রেরীর জন্যে নুতন বই পত্র কিনার উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের কথা পাড়লেন, হাসন রাজার শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদানে মুর্তজা আলীকে তিনি নিরাস করলেন না যদিও তখন কবি অসুস্থ অবস্থায় শায়িত ছিলেন। সিলেটে এসে যে চিকিৎসা লাভ করলেন তা তার শরীরের জন্যে কিছুতেই কাজ দিল না। সেদিন যখন তাঁর বোন সঈফা বানুর সিলেটের বাসগৃহ থেকে বাহির হয়ে সুনামগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা দিন তখন তাঁর মন স্বাস্থ্য নানান কারনে ভেঙ্গে চৌচির অবস্থা।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও সাক্ষাৎকার

১. " মরমি কবি হাসন রেজা", দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ

২. "সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন
৩. সাবেক চৌধুরীগনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস খান বাহাদুর দেওয়ান গনিউর রাজা ১৯২৮
৪. গানের রাজা হাসন রাজা, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, মুক্তধারা, ১৯৮৫, ঢাকা
৫. হাছন রাজার সঙ্গীতমালা, অমিয়শঙ্কর চৌধুরী, বিপ্লব দাশ ক্যাম্প প্রকাশিত, ১৯৯৯, কলকাতা
৬. Y. Edward, 100 Songs of Hason Raja, Pathak Shamabesh, Dhaka, Bangladesh, 1999
৭. প্রকাশিতব্য আনোয়ার রাজা কর্তৃক আমার প্রতিদিনের ডাইরি ১৯৬৬/৬৭
৮. হাসন রাজা জীবন ও কর্ম, সামারীন দেওয়ান, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ঢাকা
৯. প্রেমের রাজা হাসন রাজা, মীর লিয়াকত আলী, রামশংকর দেবনাথ, বিভাস, ফেব্রুয়ারী, ২০১৬,ঢাকা
১০. Edward 1999, 100 Songs of Hasonaja; P. xxii
১১. সিনিয়র এডভোকেট তৌফিক চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

ভ্রমন কাহিনী

আমার হাওর বিলাস

শারমিন আক্তার মৌ

হাওর মানেই চারদিকে যইথই পানি, ছোট নৌকায় মানুষের পাড়াপাড় আর দ্বীপের মত ভেসে থাকা গ্রাম। ক্রমনপ্রেমী এবং কিশোরগঞ্জে আমার গ্রামর বাড়ি হওয়ায় হাওর আমার কাছে আলাদা বিশেষত্ব বহন করে। আর তাই মিঠামইন ক্রমন করেই ফেললাম গত বর্ষার মৌসুমে।

ঢাকা থেকেই প্রথমে চলে গেলাম নিজের বাড়িতে, তারপর সব ভাইবোন মিলে কিশোরগঞ্জের একরাপুর থেকে লোকাল সিএনজি নিয়ে চামড়া বন্দর ঘাটে। সেই ভাড়া নিয়ে হাওরে সৌন্দর্য উপভোগ করতে চলে গেলাম । চারদিকে থৈ থৈ পানির শব্দ এক ধরনের মনোমুগ্ধকর আবেগের তৈরি করে। চার পাশে ছোট নৌকায় করে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য ভাল লাগছিল বেশ। ছোট ছোট বাচ্চাদের পানিতে সাঁতার কেটে মজা করার দৃশ্য আমাদেরকেও যেন শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বর্ষার হাওরের চারদিকে অথৈ পানি দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা সাগরের ঢেউয়ের সাথে মিতালী করছি। হাওর ক্রমনের পর আমরা আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্য বের হলাম যার মধ্যে মালিকের দরগা, দিল্লির আখড়া ও রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এর বাড়ি উল্লেখ যোগ্য ।

এই হাওর এলাকার নৌকা বাইচট খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা যা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। পুরোটা দিন আমরা অসাধারণ আনন্দের কাটালাম । এবার ফেরার পালা, অটোরিক্সায় আমরা একরামপুর ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে গেলাম। হাওর ক্রমন আমার জীবনে স্বরণীয় হয়ে থাকবে।

শারমিন আক্তার মৌ
প্রভাষক ॥ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

আমার যান্ত্রিক নগরী

॥ তৌহিদুল ইসলাম লিমন ॥

যান্ত্রিক এই নগরী। এই নগরীতে আমি বড্ড বেমানান। সব কিছুতেই কৃত্রিম এর ছোঁয়া। কোনটা আসল কোনটা নকল এটি এই নগরীতে চেনা বড়ই দায়।এই নগরী কৃত্রিমতা জর্জরিত বিদঘুটে এক বিষন্ন মানচিত্র।এখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত শীত, বসন্তে কারো দৃষ্টি নেই।গরম কাল আর ঠান্ডা কালের সাথে এই নগরীর মানুষগুলো বেশি পরিচিত। এখানে জীবিকার তাগিদে মানুষ জীবন জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলে প্রতিদিন রাত।আমার এই নগরীতে সূর্যের সোনালী আলো চাঁদের কিরণ খুবই বেমানান। আমার এই নগরীতে কখনো সূর্য ওঠে কখনিবা সূর্য ডুবে যায় কেইবা রাখে এর খেয়াল ।

এই নগরীতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আস্ত ঘড়ির কাঁটায় সীমাবদ্ধ। এই নগরীতে মানুষ সহসা পদ পদবীর লোভে সত্য মনুষ্যত্ব বেছে। এই নগরীতে একজনের ঘাড়ের ওপর পাড়া দিয়ে আরেকজন উপর উঠে । এই নগরীতে চা-পানের বকশিস ৫-১০লাখ টাকা হয়। এই নগরীতে মানুষ মানুষের রক্ত চুষে খায় ঠিক যেন জোঁকের মত। এই নগরীতে দিনে দুপুরে মানুষ বিক্রি হয় বেশ সস্তায়। আমার এই নগরীতে প্রাণপ্রিয় প্রেমিক ও ভয়ঙ্কর ধর্ষক হয়। এই নগরীতে জন্মদাতা পিতার হাতে ও ধর্ষণ হয় ছোট্ট মেয়েটি।

এই নগরীতে একই বিছানায় শুয়ে থাকা ভাইয়ের হাতে খুন হয় ভাই। এই নগরীতে সম্পত্তির ভাগে পিতাকে রক্তাক্ত করে পুত্র আদুরে।বস্তাবন্দী লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় চৌরাস্তার মোড়ের অদূরে। আমার এই নগরীতে অমানুষ গুলো ঘুরে বেড়ায় মানুষের মুখোশের আন্তরালে। কোনটা মানুষ কোনটা মানুষ চেনা বড়ই দায় এই নগরীতে। আমার এই নগরীতে প্রেম নামক শব্দটা হাস্যকর শোনায় এখানে দিনে লাভ ইউ রাত্রে ব্রেকআপ হয়। আমার এই নগরীতে অর্থ হলে অঙ্গ রঙ্গ সঙ্গ সব কিছুই মেলে।

এই নগরীতে কায়া ছায়া আছে কেবল মায়া বলতে কিছুই নেই। এখানে রোবটের মতো ছুটে মানুষ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব চরম যেনো।আমার এই নগরীতে ক্ষমতার জোরে নত সব কিছু।জি হ্যাঁ এটাই আমার যান্ত্রিক নগরী এর মাঝেই জীবন নিয়ে প্রতিনিয়তই চলি।

পারমাণবিক যুদ্ধ ও পরবর্তী পৃথিবী

॥ মাহমুদুল হাসান অন্তর ॥

প্রিয় পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তো। পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। ছেয়ে গেছে ধূলি ধূসর অন্ধকারে।জমিনের বুকে পৌছায়নি সূর্যের কিরন। বরফে ঢেকে নিরেট হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ভূখন্ড। কি..? হলিউডের সায়েন্স ফিকশনের মতো ভাবতে শুরু করেছেন তাই তো.?? হ্যা, ঠিক এই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে যদি পৃথিবীর যেকোনো দুই পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে বেধে যায় পারমানবিক যুদ্ধ। আমরা কল্পনায় নিয়ে আসি আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই শক্তিশালী পারমানবিক রাষ্ট্রকে।প্রতিটি রাষ্ট্রের মজুদে থাকা পারমাণবিক বোমার অর্ধেক ও যদি বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলেও বদলে যাবে পৃথিবীর ভূখন্ড চিত্র। জলবায়ুর উপর পড়বে প্রকট প্রভাব। তবে,এই বিভীষিকাময় বিরল অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করার মতো কেউ থাকবে কি না তা বড় একটি প্রশ্ন।

সত্যিই যদি একটি নিউক্লিয়ার ওয়ার বেধে যাই কি হবে এই ইট পাথরের সাজানো পৃথিবীর। বিভিন্ন জার্নাল,ডকুমেন্টস ও গবেষকদের অফুরন্ত লেখা থেকে কিছু যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতা তুলে ধরলাম।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রটগার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত জলবায়ু বিশ্লেষক এন্যাল বারাক সবচেয়ে সহজভাবে যুদ্ধ পরবর্তী দুর্যোগের প্রভাব ব্যাখা করেছেন।পৃথিবীতে বিদ্যমান পারমাণবিক বোমার অর্ধেকের অর্ধেক ও যদি ব্যাবহার হয় তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে যদি কেউ বেচেও যাই তবে পরোক্ষ প্রভাব থেকে কেউই রেহাই পাবে না। বোমা বিস্ফোরণের পর প্রায় ৭ লক্ষ টন ধোয়া, ছাই ও ধূলিকণা বায়ুতে মিশে যাবে এবং সূর্যের আলো আটকে দিবে। প্রায় ১ বছর পর্যন্ত এসব ধূলিকনা ও ছাই দিয়ে আকাশ অন্ধকার হয়ে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। ফলে সূর্যের আলোর অভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসবে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১-১৫ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমন্ডলেত তাপমাত্রা দাঁড়াবে প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পরিবেশের ভারসাম্য ও ফুড চেইন নষ্ট হবে। সামুদ্রিক অঞ্চলে সৃষ্টি হবে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়। মহাজগতে প্রচুর তুষারপাতে কয়েকদিনেই নির্মূল হয়ে যেতে পারে পুরো প্রাণীজগৎ। এছাড়া পারমানবিক বিস্ফোরণের অগ্নিপিন্ড থেকে যে বিপুল পরিমান নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টি হবে তা পুরোপুরি ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ফলে সূর্যের আলোর সাথে পৃথিবীতে প্রবেশ করবে বিপদজনক অতি বেগুনি রশ্মি যাকে বলে আল্ট্রা বায়োলেট রে। অতিরিক্ত অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহ ও অন্যান্য প্রাণীদের ডি এন এ অনুর গঠন প্রনালী ভেংগে দিতে পারে,এবং ক্যান্সার কোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা হাজারগুণ বেড়ে যাবে। যার মানে এটাই যে,বোমা বিস্ফোরণে যদি কোনো প্রাণী বেচেও থাকে তবুও তার শরীরে বাসা বাধবে ক্যান্সার। শুধু তাই নয়,দু- তিন

মাস সূর্যালোক ও ভারী তুষারপাতে সমস্ত পৃথিবী ঠান্ডা ও শুষ্ক হয়ে যাবে। বিরল এক নিউক্লিয়ার শীতকালে প্রবেশ করবে পারমানবিক বিস্ফোরণের পরবর্তী পৃথিবী। পৃথিবী প্রবেশ করবে গাছপালা হীণ এক বিরান মরুভূমিতে। এমন ঠান্ডা,শুষ্ক পৃথিবীতে ফসল ফলবে না। নিউক্লিয়ার চেইন রিয়েকশানের ফলে হাজার হাজার কিলোমিটার মাটির উর্বরতা নষ্ট হবে।

খুব অল্পদিনেই মজুদ খাদ্য শেষ হয়ে সমস্ত প্রাণী মুখোমুখি হবে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে। না খেয়ে মারা যাবে দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ। শুধু উপকূলে বসবাসরত কিছুসংখ্যক মানুষ মাছ ও পশু শিকার করে বাচার চেষ্টা করবে। পারমানবিক বিস্ফোরণের চার বছর পর আস্তে আস্তে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌছাবে। কিন্তু সূর্যের আলো শোষণ করার মতো কোনো ক্ষমতা থাকবে না। পৃথিবী ক্রমে ঠান্ডা হতে হতে আবার বরফ যুগে পৌছাবে। অতি রেডিয়েশনের প্রভাবে চামড়ার ক্যান্সার আরো প্রকট আকার ধারন করবে। দশ বছর অতিক্রম কালে হয়তো পৃথিবী ঘুরে দাড়ানোর প্রচেষ্টায় থাকবে,তবে ২০-২৫ বছর আগে কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতা ভাগাভাগি ও পুজিবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থার দৌড় থেকে শুরু হয়েছিলো এই ব্যাতিক্রমী এক যুদ্ধের। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বুলেটবিহীন এক যুদ্ধ চলেছিলো যার নাম ছিলো কোল্ড ওয়ার।ময়দানে নয়,যুদ্ধ হয়েছিলো কূটনীতির টেবিলে, প্রতিযোগিতা হয়েছে বাজার দখলে,খেলার মাঠে এমনকি সাংস্কৃতিক পর্যায়েও।তবে এই সময়ের মাঝে অর্থ্যাৎ নব্বই দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যবনিকা পতনের আগে বেশ কয়েকবার দেশ দুটি মুখোমুখি হয়েছে। এমনকি পারমানবিক আক্রমণের হুমকি ও ছিলো। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও ভারত মহাসাগরে দুই দেশ মুখোমুখি হয়েছিলো। তবে কোনো যুদ্ধ হয়নি।সভ্যতার আদিত্য মানুষ তাদের ক্ষুদা নিবারনের জন্যে প্রথম হাতিয়ার বানিয়েছিলো। আরো সহজভাবে বললে,অন্য প্রাণী শিকার করে নিজ উদরপূর্তি করতে এই হাতিয়ারের ব্যাবহার ছিলো। কালের পরিক্রমায় সেই হাতিয়ার আরো উন্নত হয়েছে। সে সঙ্গে বদলে গেছে লক্ষ্য বস্তু।এখন আর প্রাণী নয়,মানুষ মারতেই বিজ্ঞানের অতি বৃহৎ আবিষ্কার পারমাণবিক প্রযুক্তিকে ব্যাবহার করছে আরেক মানুষ। এখন সময় এসেছে,আমরা কি যুদ্ধের পরবর্তী প্রভাব ভাববো নাকি কিভাবে এমন যুদ্ধ বন্ধ করা যায় তাই নিয়ে ভাববো.....???

মাহমুদুল হাসান অন্তর ॥
(ব্যাচঃ ২০১৮)

মূল্যবোধ

॥ নুসরাত জাহান ॥

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। কালের পরিক্রমায় মানুষকে নানা রকম রীতিনীতির সাথে অভ্যস্ত হতে হয়। সমাজের বিবর্তনের ধারায় কিছু রীতিনীতি ও আচরণ সমাজের মানুষের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব সাধারণ নিয়মগুলো সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আবার নিয়মগুলো ভঙ্গ করলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। এসব নিয়মকানুন গুলোই মূল্যবোধ। মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

আর যে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে তাই হলো মুল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। এটি মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সুনাগরিক গড়ে তোলা। মূল্যবোধের শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকে। ছোটবেলা থেকেই একজন শিশুর মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস নিয়ে বড় হতে হবে যে পারিবারিক শিক্ষাই তাকে সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করবে। বাবা-মা তার সন্তানকে শৈশবকাল থেকে ভালো-মন্দের শিক্ষা দেন। বাবা-মা শিশুকে বলে দেন এটি ভালো, এটি ভালো কাজ নয়। এ কাজ করবে, ওই কাজ করবে না।বাবা-মা শিশুকাল থেকে সন্তানকে শিক্ষা দেন, 'ছোটদের স্নেহ করবে, বড়দের সম্মান করবে'। অন্যকে তার কাজের জন্য অগ্রাধিকার দেবে। নিজে সংযত হয়ে চলবে। ভালো ব্যবহার করবে। আমরা সকলেই ছোটো বেলায় আদর্শ লিপিতে পরেছি "সদা সত্য কথা বলিবে"," অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করুন"। বইয়ের পাতার এই কথা গুলো আমরা বাবা-মা অথবা দাদা দাদীর মুখ থেকেই শিখেছি। এভাবে শিশু তার ঘর থেকেই মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করতে থাকে। তাই পরিবারকে 'প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র' বলা হয়।

শিশুরা নৈতিক মূল্যবোধ শিখে থাকে প্রথমত তাদের পরিবার থেকে। এরপর সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তারা নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা লাভ করে। শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমি মনে করি প্রতিটি দেশের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্য জানা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যা সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই সময় এসেছে মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাববার। শ্রেণিকক্ষে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য বই পাঠদানের পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার ওপর শিক্ষামূলক গল্প ও উপদেশমূলক কথা বলার উপর শিক্ষকদের আরো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তবে শুধু উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সামনে এমন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যা সহজেই শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। কারন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান শিক্ষক একজন ছাত্রের কাছে আদর্শ স্বরূপ।

অর্থাৎ একজন শিক্ষক নিজে কতটা সৎ, কতটা দেশ-প্রেমিক, কতটা মানবিক তা তার দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের কথায় ও কাজে বিশ্বাস স্থাপন করে নৈতিক মূল্যবোধে

উজ্জীবিত হতে পারবে।বর্তমান প্রজন্মের বেশির ভাগ ছেলে মেয়েরা উপদেশমূলক কথা শুনতে আগ্রহী নয়। তাই একজন শিক্ষক যদি সৎ কর্মনিষ্ঠ হয়, নিজের সততার মাধ্যমে মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয় তবে শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেম, মানবিকতা ও নৈতিকতার বাস্তব শিক্ষা দিতে পারবেন।

মূল্যবোধের শিক্ষা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, বরং প্রচলিত শিক্ষায় মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বস্তুত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এককভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়।

প্রথমত পারিবারিক শিক্ষা ও পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়ের সংমিশ্রণে একজন মানুষ মানবিকতা ও নৈতিকতার বাস্তব শিক্ষা গ্রহন করতে পারবেন। কারন নৈতিক মূল্যবোধ শুধু আদব-কায়দার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং অসৎ কাজ বর্জন করা ও সৎ কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরও বর্তায়।

সর্বোপরি মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করাটাই বড়ো কথা নয়, মানুষের মত মানুষ হতে পারাটাই মূল বিষয়। আর একজন সৎ, মানবিক ও নিষ্ঠাবান মানুষ হতে হলে মূল্যবোধ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

নুসরাত জাহান ॥
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর, প্রভাষক (কৃষিশিক্ষা)

যানজট যানজট

শেখ এনামুল হক

যানজট যানজট
ঢাকা শহরে জীবন নিয়ে সংকট
সাধারণ যাত্রীর হয়রানি গরমে পেরেসানি;
তনু দিয়ে ঝড়ে পানি
ট্রাফিক সংকেত যেন ভাঙ্গা বাতি
হেলপারের কথন যেন পুঁথির গীতি।
যানজট যানজট
কাঠালের আঁঠার মত ছারে ধরে
বেধেঁছে একাজোট পিঁপিড়ার সারি;
নানা রং বেরঙের গাড়ি
রাস্তার উপরে উড়াল সড়ক
নজর যেন অজগরের সারি।
যানজট যানজট
যেতে হবে তাড়াতাড়ি
কে কার ধার ধারে চালায় গাড়ি;
হুকায় দাদা যেমন দিত টান দমছাড়ি
ঢাকা শহরে তেমনি চলছে গাড়ি
রিক্সার নগরী ঢাকা দমে দমে ঘুড়ে চাকা।
যানজট যানজট
ফার্মগেট,শাহবাগ,গুলিস্থান,যাত্রাবাড়ী,নীলক্ষেত
যেন সারি সারি গাড়ির ক্ষেত;
গুলিস্থানে যাত্রী নিয়ে টানাটানি
নতুন জামাই নিয়ে যাচ্ছে যেন শ্বশুর বাড়ি
মাঝ পথে ভাড়া নিয়ে বাক-বিতান্ডা।
যানজট যানজট
নিজস্ব গাড়ি ভূড়ি ভূড়ি যেন মামার বাড়ি
লোকাল গাড়ি ভাড়ায় সস্তা;
কৃষক যেমন বুড়ো গরু দিয়ে জুড়ে হাল

লোকাল বাসে তেমনি বেহাল
ফুটপাতে হকারের উৎপাত হাঁটা মুশকিল
যানজট যানজট
ঢাকা শহরে জীবন নিয়ে সংকট
গাড়ির কালো ধোঁয়া হদয় দিচ্ছে ছোঁয়া ;
মানুষের উপর মানুষ চড়ে দ্বিতল বাসে
পল্লীর মেঠো পথে মুক্ত স্বস্তির নিশ্বাস
শহরে জীবন জ্বালা যানজট।

মোঃ এনামুল হক
প্রভাষক- যুক্তিবিদ্যা

প্রেমের কবিতা

তুমি আমার রঙ্গিন স্বপ্ন,
শিল্পীর রঙ্গে ছবি-
তুমি আমার চাঁদের আলো,
সকাল বেলার রবি-
তুমি আমার নদীর মাঝে
একটি মাত্র কূল-
তুমি আমায় ভালোবাসার
সুন্দর গোলাপ ফুল-

হারিয়ে যাবো

হারিয়ে যাবো যেদিন আমি
দেখতে এসো আমায়
বিরক্ত আমি করতে সেদিন
রাখবো তোমার মান
নিথর বুকে লেখা থাকবে শুধু তোমার নাম

মোঃ নাজমুল হাসান স্বাধীন
বিভাগ: বিজ্ঞান
রোল: ১২৩১৩

একলা একাকিত্ব

সজীব আহাম্মেদ

যদি দেখ
আমাকে মেঘ ডাকা বন্ধ হয়ে যায় বৃষ্টি যদি নাহি আসে ভুবনে
শ্রাবণ সন্ধ্যা আর মেঘলা আকাশ যদি থমকে থাকে!
যদি তোমাকে পাওয়ার আক্ষেপ বৃষ্টির ছোঁয়া লুকিয়ে থাকে
তুমি কি জানো.?
একলা একাকিত্ব কারে কয়।

যদি দেখ
বৃক্ষ পাতার আড়ালে চাদ যদি নাহি উঠে আকাশে
মিটমিট করে জ্বলা তাঁরারাজি যদি না আশে অপলক দৃষ্টিতে প্রমিক-প্রেমিকার অনুভবের জোছনা স্নাত রাতটুকু হয়
যদি কৃষ্ণ বিবরের মতো স্তব্ধতা!
তুমি কি জানো?
একলা একাকিত্ব কারে কয়।

যদি দেখ
মৃদু বাতাসে ঝরে যায় পৃথিবীর সকল ফুলগুলো ফুলের সৌরভ যদি নাহি আশে বাতাসে
প্রেমিকার চুলের খোপা যদি হয় ফুল শূন্য ভ্রমর মধুর খোঁজে যদি হয় দিশেহারা!
তুমি কি জানো?
একলা একাকিত্ব কারে কয়।

আমার মা

তনুশ্রী চন্দ্রশীল

মাকে ছেড়ে অনেক অনেক দূরে
বাবাকে ছেড়ে অসহায়-
একা আমি কিছুই জানি না
কিছুই বুঝি না কী করবো হায়-
জীবনে চলার পথে করেছি অনেক ভুল
এখন আমায় দিতে হয় সে ভুলের মাশুল।
বাবা মাকে ছেড়ে একা থাকা বড় দায়
ভুলে ভুলে জীবন আমার করি কি উপায়,
মাগো তোমাকে দিয়েছি কতো যন্ত্রনা
কখনো বুঝতে চাইনি তোমার মনের বেদন,
হাজারো ব্যাথা সহ্য করে নিয়েছো
আমায় বুকে টেনে-
দেইনি তোমায় একটুও সুখ এই ভুবনে
রাতটা আমার কাটে বড়ই একা।
কোথায় গেলে বল মা পাবো তোমায় দেখা,
কষ্ট ভরা এ বুক আমার শুধুই যন্ত্রনা
এ মনের ব্যাথা কেউ বুঝলো না মা কেউ বুঝলো না।

২০২০-২১ শ্রেণী: দ্বাদশ
রোল: ১২২০৫ বিভাগ: মানবিক।

বন্ধুত্ব

বলিসনে তোরা হারিয়ে যাবো
অচেনা শহরে ভীড়ে।
হাসবো মোরা একই সাথে
যখন হবে দেখা,
কষ্ট পাবো আমরা তখন হবো যখন একা।
ভুলবি কি তোরা আড্ডা মোদের
সেই যে হাসাহাসি,
কখনো ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে আমরা
ক্লাসে দেই ফাঁকি।
কখনো কফি হাউজের গানে
বন্ধুত্বের স্মরণে,
বন্ধুদের সাথে হবে না দেখা মনে পড়লে
জল এসে যায় নয়নে।
তোরাও চলে যাবি ---
অজানা শহর অজানা নগরীতে
আমিও ঠিক তাই!
তাই বলে ভাবিস না, ভুলে যাব তোদের
কারণ তোরা ছিলি ,তোরা আছিস
জানি তোরাই থাকবি----বন্ধু!

মাইসেল চাকমা
শ্রেণী: দ্বাদশ(ব্যবসায় শিক্ষা) রোলঃ ১২১০৬

প্রবাস ভাবনা

শীতল হাওয়া মুখ থুবরে বসে আছে
তার এই স্নিগ্ধ প্রবাস জীবনে।
কতকাল দেখিনি সে তারার মাতৃভূমি,
কতকাল পাদুকা রাখিনী দিগন্ত প্লাবিত স্থানে।
প্রবাস জীবন আজ করেছে বন ঘুড়ে জড়তা
কষ্টে আবদ্ধ এই চোপায়া সেটাও মনে করিয়ে দেয়
অতীত জীবনের মায়া ।
ইট পাথরের শোভিত এই নগরে
দিন শেষে ক্লান্ত মনটা যেন মুখ থুবড়ে পরে
ফিরে পেতে চাই সেই মায়া,
সেখানে তো আছে আমার মায়ের
আচঁল খানার শীতল ছায়া।
চলে যাব প্রবাস ছেড়ে আপন কুঁড়ে ঘরে,
নতুন করে রব সেথায় সাহচার্য লয়ে।
হবো নাক নৈরাশ্যবাদী অন্তরে গেঁথে নিব
পিদিম ভালোবেসে।

মোঃ তাহসিন সিকদার
শ্রেণী: দ্বাদশ(ব্যবসায় শিক্ষা)
রোলঃ ১২১০৮।

কৃষ্ণাচূড়ার প্রেম

সেদিন যাচ্ছিলাম বাসে
হঠাৎ চোখে পড়লো
গাছে ফোঁটা সেই লাল কৃষ্ণাচূড়া
বুঝি আমায় দেখে হাসে।
রক্তরাঙ্গা রং টকটকে তার দেহখানি
তাই তো তার দিকে যাচ্ছিলো
আমার মন টানি
ও কৃষ্ণাচূড়া তুমি কেন এত সুন্দর ?
কেন আমায় দেখলেই খুশিতে ভরে
ওঠে আমার অন্তর ?
জানি না কেনো কৃষ্ণাচূড়া আমার বুকে
এনেছে নতুন রেখা,
সেই স্মতি মনে করেই আজ কবিতা লেখা।

ভাষা সংগ্রাম

আকাশ ভরা চন্দ্র তারা নদী ভরা জল,
আর দেব না মরতে মোরা বাঙ্গালিদের দল।
আমাদেরও সম্মান আছে,আছে মাতৃভাষা,
কেন আমরা মেনে নেবো তাদের উর্দুভাষা।
এতকাল সয়েছি শুধু তাদের অত্যাচার,
আর দেব না হতে মোরা এই অনাচার।
করবো মোরা প্রতিবাদ বুকের রক্ত ঢেলে,
মাতৃভাষার শক্তির জোড়ে বিজয় আনবো কেড়ে।
শেষ দিনেও গেয়ে যাবো বাংলাদেশের গান,
সেই দিনেও থাকে যেনো বাংলাদেশের প্রাণ।
কাউকে মোরা করবো না তো ভয়,
মরার আগে দেখে যাবো মাতৃভাষার জয়।

সোনিয়া আক্তার
শ্রেণীঃএকাদশ(বিজ্ঞান শাখা)
রোলঃ১৩৩০১

অশ্রুর চোখে এই মিনতি
মুছে দাও পাপ কালিমা
তুমি ছাড়া কে-বা আছে
ছড়াবে ক্ষমার লালিমা!
সবাই যখন মগ্ন ঘুমে
উঁচু শিরটা করি নত
জায়নামাজের আলিঙ্গনে
হেরার সুরে থাকি রত।
গুনার দিকে না তাকিয়ে
ক্ষুদ্র নেকির অসিলাতে
পার করে নাও পাপের সাগর
অটুট রেখো রিসালাতে।
নিরাশ হওয়া জায়েজ নেই
মুমিন যদি হয়ে থাকি
আরোশ ছায়ায় নিবন্ধিত
করবে আমায় আশা রাখি।

“ধিক্কার”

নীলাঞ্জনা ওঠো, চক্ষু মুদিয়া
হাতে ধরো এবার অস্ত্র,
সর্বনাশ যারা করেছে তোমার
তাদের করো বিবস্ত্র।
এসিডে যারা মুখখানি তোমার
ঝলসে দিয়েছে একবার,
তোমার সারিতে আছে যত নারী
প্রতিনিধি হও তাদের বার বার।
একটা আঙ্গুল তুলে দিয়ে বলো কারা ছিল এদের দলে,
আঙ্গুল তুলে দিয়ে বলো
কারা ছিলো এদের দলে,
আঙ্গুলটাকে এবার বন্দুক বানিয়ে
লাশ করে যাও চলে।
ভয় কি তোমার? মারই বাঁচো
বাচাঁর মতোই বাঁচা,
দুর্বল হলে হাসবেই ওরা
বিকৃত হাসির হাসা।
তোমার মনের অগ্নিবাণী
সভাতে তুলে ধরো,
সাহসী হয়ে মনোবল নিয়ে
লড়ার মতোই লড়ো।

সমাজ কি? সামাজিকতা কি??
মানবতা কি ? জানে না ওরা
পরিবার থেকে পায়নি শিক্ষা
জ্ঞানহীন পশুর মতোই জীবন গড়া।
মানুষ হওয়ার প্রথম সোপান
একটি পরিবার,
এমন একটি পরিবার ফেলে
জীবন ধন্য তার।
আঁচলে মুখ লুকিয়ে না আর
করো এর প্রতিকার,
সবাইকে জানাও সামাজকে জানাও
দিক সকলে ধিক্কার।

সৃষ্টি দত্ত
শ্রেণীঃ একাদশ (মানবিক শাখা)
রোলঃ১৩২০১

চাকিলিনি সামুং ও ক্রিমা

কৃতী বাবু ত্রিপুরা

ও চাকিলি বরক,
তা ক্রিদি নক।
চিনি বরকনি গাম নকনি য়াগছে,
বাচাদি নক যত।
ফাইদি যত নক,
বরকনি বাগই কিসা,
সামুং তাংগৈই থাংনি।
তা ক্রিদি নক।
হাপোং, হাথাই চরক ন পার খায়ই,
মাতাং ন বরনি বাগৈই সামুং।
তা ক্রিদি নক।
মাতুং ন নকনি অর বাখা কারাক,
চায়া বরকনি বিরুদ্ধে সামুং তাংনি।
তা ক্রিদি নক।
বাখা চায়া মাতুং গালাক নকনি অর,
কক বাকসা মাতুং নক,
মাতিসা ন কক বাকসা চিনি বরক।
সাল হাই নক ব মাখাই ন ধোয়া, চিনি বরক ন।
তা ক্রিদি নক।
যুবকের দায়িত্ব ও ভয়
ও যুবক সমাজ,
ভয় করনা তোমরা।
সমাজের উন্নতি তোমাদের হাতে,
জেগে উঠো তোমরা।

চলে আসো সবাই,
জাতির জন্য হয়ে সামান্য কাজটুকু করে যাই।
ভয় করনা তোমরা।
পাহাড়, পর্বত সব বাধা অতিক্রম করে,
কাজ করতে হবে সমাজের হয়ে।
ভর করনা তোমরা।
থাকতে হবে সাহস তোমাদের মাঝে,
দুর্নীতিকে রুখে দিতে।
ভর করনা তোমরা
হিংসা-বিদ্বেষ থাকা যাবে না
তোমাদের মাঝে।
গড়ে তুলতে হবে, ঐক্য বদ্ধ সমাজ ।
সূর্য মত আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে হবে।
ভয় করনা তোমরা।

মন খারাপ

তাহমিনা আক্তার

মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে
সোনা রঙ হেরে যায় মেঘের ছোঁয়ায়,
মেঘগুলো স্লেট রঙ এ হাত বুলায় আকাশে
এমন বাদল দিনে তোমার অস্তিত্ব বড় বেশি কাঁদায়,
স্মৃতিরা ঘুর ঘুর করে বাদল হাওয়ায়।
পথের পাশে বসে থাকি
বড় বেশি মন কেমন করা বাতাসে ,
আঁচল উড়িয়ে তোমার আশ্বাসে,
বিকেল মিশে যায় রাতের তারায়।
সেই মন খারাপ সেই মেঘলা বিকেল,
এখনো আগের মতন
আমার অপেক্ষার হয় না শেষ,
ন্যাপথলিনে মুড়িয়ে সয়তন।
মন খারাপ করা বিকেল রেখে যায় বেশ।

ভুলি কেমনে

মোঃ সাহিন আলম
বিভাগঃ ব্যবসায় শিক্ষা ব্যাচঃ ২০১৬

তুমি তোমায় ভুলতে বল
বল তো ভুলি কেমনে ?
তোমার পরশ এখনো যে আছে,
বল তো ভুলি কেমনে?
এসেছিলে মোর পাশে,
মাধবীর সুভাসে
হিয়াতে হিয়ার কাছে।
বলতো ভুলি কেমনে?
জোছনা রাতের গহন মায়ায়
ছিলেম দুজনে মগ্ন।
কখন কি ভাবে বয়ে গেল
সেই শুভ নগ্ন
আমি তাই বসে হায়,
স্মৃতির স্বপ্ন একে যাই।
কভু যদি ফিরে পাই
তোমায় এ জীবনে !
বলতো ভুলি কেমনে।
আমার যান্ত্রিক নগরী
যান্ত্রিক এই নগরী। এই নগরীতে
আমি বড্ড বেমানান। সব কিছুতেই
কৃত্রিম এর ছোঁয়া।কোনটা আসল
কোনটা নকল এটি এই নগরীতে চেনা বড় দায়।

এই নগরীতে কৃত্রিমতায় জর্জরিত
বিদঘুটে এক বিষন্ন মানচিত্র।এখানে
গ্রীষ্ম,বর্ষা,শরৎ,হেমন্ত শীত, বসন্তে কারো দৃষ্টি নেই।
গরম কাল আর ঠান্ডা কালের সাথে এই
নগরীর মানুষ গুলো বেশি পরিচিতি।
এখানে জীবিকার তাগিদে মানুষ জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলে
প্রতিদিন রাত আমার এই নগরীতে
সূর্যের সোনালী আলো চাঁদের কিরণ
খুবই বেমানান আমার এই নগরীতে
কখনো সূর্য ওঠে কখনো আবার সূর্য ডুবে যায় কেইবা রাখে এর খেয়াল।
এই নগরীতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আস্ত ঘড়ির কাঁটায় সীমাবদ্ধ
এই নগরীতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আস্ত ঘড়ির কাঁটায় সীমাবদ্ধ
এই নগরীতে মানুষ সহসা পদ
পদবী

****কল্পকন্যা****

কারো পায়ের নড়াচড়ায় বেজে ওঠে নুপুরের শব্দ।
-এই চোখ খুলো!
নারী কণ্ঠের ডাকে অপ্রস্তুততভাবে চোখ খুলি।হেমন্তের পরিষ্কার আকাশ
বেয়ে পড়া চাঁদের আলোয় নিজেকে নির্জন নদী কিনরায় আবিষ্কার করি।
অস্পষ্ট পরিবেশ।কোনটা ছায়া কোনটা কায়া কিছুই বুঝা যাচ্ছে
না!পাশে ফিরতেই মিষ্টি একটা ঘ্রান নাকে আসে...তার চুলের সুভাষ।
-কে তুমি?
-তোমার কল্পকন্যা!
-তোমারতো এখানে থাকার কথা না!
-থাকার কথা না বললেই হলো!আমি তোমার সাথেই থাকবো...সব
জায়গাতেই।
কল্পনায় বিচরণকারী কল্পকন্যা বড্ড অবাধ্য।
-চলো!
-কোথায়?
-ভোর হওয়া পর্যন্ত হাটবো তোমার সাথে।
ও আমার বাহু জড়িয়ে হাঁটতে থাকে।কুয়াশা ভেজা ঘাসের উপর নগ্ন
পায়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে..ঝুমঝুম নুপুরের শব্দে।
কিছু দূর যাবার পর কল্পকন্যার এক পায়ের নুপুর খুলে যায়।চাঁদের
আলোয় ধাতব প্রতিফলন হয়!পিছন ফিরে নূপুরটি তুলে
আনি।কল্পকন্যার সামনে হাঁটু ভাজ করে বসি।
-পা তুলো।
কল্পকন্যা পা তুলে আমার হাটুর উপর রাখে।দুহাতে তার পায়ে নূপুরটি
পড়িয়ে দেই।নুপুর পড়াবার সময় তার পায়ের পাতায় এক ধরনের
কাপন অনুভব করি।
খুব ইচ্ছে হলো কল্পকন্যার চোখে তাকাই।কিন্তু না...তা সম্ভব
নয়!কল্পনায় কারো মুখচিত্র তৈরী করা সম্ভব না!
-বাস্ড়বতা আমাদের দূরত্ব!- হুম!
-ভয় হচ্ছে খুব!
ভয়ার্ত কল্পকন্যার হাত শক্তকরে চেপে ধরি।
-ভয় পেয়ো না...চিরোদিন সাজিয়ে রাখবো তোমায়!

এক অন্ধকার ও মৃত্যু

একবার জীবনকে ছুয়ে দেখি
এ আমি- অন্য রকম।
পৃথিবীর ছায়ায় নয়- এইখানে
এই অশ্বত্থের ছায়ায় বসে।
অনেক ভেবেছি,খুজেছি,চেয়েছি
যাও অর্ধেক পেয়েছি
তাও গেছে খসে,অবহেলায়।
বুকের পাজরে শ্যাওলার স্তূপ জমিয়ে
শকুনের চোখে নখে রক্ত মাখিয়ে
আমি কিছু অন্ধকার পেয়েছি।
ঘুটঘুটে অন্ধকারে শহরের বুকে
দেখেছি অবাক বিস্ময়ে !
ভিক্ষুকের থালার দানের পয়সা
কীভাবে লুট করে
মহা- মানবেরা।
কিছু আঘাত পৃথিবীর ওপারে ফেলে
সমুদ্র তৃষ্ণা বুকে চেপে ধরে
নিষ্প্রাণ চোখে পূর্ণিমা মাখিয়ে দেখি,
একটি কুকুর থেমে থেমে
গিলে খাচ্ছে একটা আস্ত রাত।
আমার ঘরের সব কিছুই এখন বড্ড মায়াময়
মানুষের মৃত্যুর কাছাকাছি এসে বুজে যায়
এসব রংচটা দেয়াল,চশমার কাচ
তার কতোটা স্মৃতির অংশ৷

শ্যামলী আক্তার
অ্যাকাউন্স অফিসার

ফুল ঝুঁড়ি

হাতে আঁকা ফুল যে আমার
মনের মতো করে।
দিনের বেলা ফুটে ওঠে,
রাতের বেলা ঝরে।
গোল কোনাকার পাপড়ি তাহার
নানান রঙের নতুন বাহার ।
থাকে যে দূর পাহাড়ে,যাবো আমি তার কাছে।

শারমীন আক্তার
প্রভাষক ঃ-হিসাব বিজ্ঞান

ঝড়

সুহৃদ মেহবুব

ঝড়ের কাছে প্রশ্ন রাখা
কষ্টের
ঝড় কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না।

একদিন এক ঘুমহীন রাতে
ভাবনার তুলি থেকে শিল্প হারিয়ে যায়
প্রচণ্ড ঝড়ের কাছে আমি ঝড়োপাতার মতো
উড়ে যাই
আমি কি ঝড়ের কাছে ধ্বংস হবো
নাকি ঝড়ের ছন্দের কাছে
হারিয়ে যাবার ডাক পাবো !

অর্থ

মীর লিয়াকত আলী

'লাইফ ইজ নট এ বেড অব রোজেস'
আমি দেখি লাইফ হলো মনিটরী পোজেস
টাকা যার আছে তার ঘ্রানে ভাসে নোজেস
সুখ পাখি হলো তার সবখানে ষ্টোরেজ।

টাকা হলো সবচেয়ে মোষ্ট ইম্পরটেন্ট
হতে পারো যদি তুমি বড় কোন মার্চেন্ট
প্রতিভাটা থাকে যদি একশত পার্সেন্ট
তুমি হবে সবখানে ভেরী ভেরী আর্জেন্ট।

মাল আছে টাল হও গাল দাও বাষ্টার্ড
কানে তুমি শুনবে জেনুইন টিন-বার্ড
মাল ভরা পকেটে তুমি হলে ট্রাম্পকার্ড
ফার্ষ্ট যদি নাই হও নির্ঘাত হবে থার্ড।

পৃথিবীকে পদানত করে এই অরচিড
নাম তার অর্থ বিশাল এক অরবিট!

চিরন্তন বাণী

একজন মানুষকে সত্যিকার ভাবে জানার উপায় হচ্ছে তার স্বপ্ন জানা-
-হুমায়ূন আহমেদ

সবার সাথে তাল মিলিয়ে যে কথা বলে সে ব্যক্তিত্বহীন-
-মার্ক টোয়াইন।

#বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে আর অবিশ্বাস জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।
-মিল্টন।

সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লেও আবার উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে নৃপাত হয়।
–হযরত সোলায়মান (আঃ)

#চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোন দাগ পড়ে না।
-রবি ঠাকুর

#যখন তুমি মারা যাবা তখন তোমার ব্যাংকের যে পরিমান অর্থ থাকবে সেটা হল এই টাকা যে তুমি তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কাজ করে আয় করেছে।
-হিটলার।

উচ্চাশা যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই শান্তির শুরু হয়।
-ইয়ং।

একজন মহান ব্যক্তির মহত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যাক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।
-কার্লাইল।

বিরক্তিকর কোনো মানুষ ফ্রড হতে পারে না। পৃথিবীতে ফ্রড মাত্রই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার হয়।
-হুমায়ুন আহম্মেদ

কাউকে হারিয়ে দেয়াটা খুব সহজ ।কিন্তু কঠিন হলো কারো মন জয় করা।
-এ, পি,জে আব্দুল কালাম।

সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা

মোঃ নুরুল ইসলাম

সিলেবাসে অনেকের কাছে সীমাবদ্ধ জ্ঞানমাত্র আমার কাছে সিলেবাসের মানে অনেকটা সঠিক দিকনিদের্শনা দেওয়ার মত, পৃথিবীর এই বিশাল জ্ঞান- ভান্ডারে কোন ব্যক্তির পক্ষে সর্বজ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরুপ বিশাল সমুন্দ্রর মাঝে পাল তোলা নৌকাকে নিদিষ্ট দিকে চালানো হয় ঠিক তেমন।

তবে এটা চিরন্তনসত্য সিলেবাস আমাকে/ আপনাকে জ্ঞানী করে তোলার পর্যাপ্ত নয়, সিলেবাস আপনার একাডেমিক জ্ঞান সঠিকভাবে জ্ঞানী করতে নয়, একই সাথে সিলেবাসে অধ্যায়ণ করাও একান্ত জরুরী বলে মনে করি।

প্রভাষকঃ পদার্থ বিজ্ঞান

কৌতুক

সংগ্রহ ঃ মাহমুদা আক্তার

১. এক যাত্রী রেল স্টেশনে নেমে ঝন্টুকে জিজ্ঞাসা করল.
যাত্রী- আচ্ছা ভাই এটা কেন স্টোশন ?
ঝন্টু- শুনে মাটিতে হেসে গড়িয়ে পড়লো আর বলল আরে দানা সনেন না এটা রেল স্টেশন।

২. ম্যাডাম- ক্লাসে কি জন্য আসো ?
ছাত্র- শিখার জন্য.
ম্যাডাম - শিখার জন্য আসলে ঘুমাচ্ছো কেন।
ছাত্র- কারণ শিখা আজ ক্লাসে আসেনি।

৩. স্ত্রী-তুমি বিয়ের আগে কয়বার আই লাভ ইউ বলতে এখন বল না কেন ?
স্বামী- নিবার্চন শেষ তাই প্রচার ও শেষ।

(৪) বাবা- পরীক্ষায় কত পেয়েছিস ?
ছেলে–ু মাত্র একের জন্য একশ পাই নাই।
বাবা- তাই নাকি ৯৯ পেয়েছিস বুঝি ?
ছেলে- না বাবা দুইটা শুন্য পেয়েছি।

প্রভাষকঃ আই,সি,টি

১.শিক্ষকমণ্ডলীর একাংশ

২.বিজ্ঞানবিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলী

৩.শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

৪.শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলী

৫.শিক্ষা সফর -২০২২

৬.বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

৭.কলেজ ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক

৮.প্রধান ফটকে শিক্ষকমণ্ডলী

৯.প্রাণোচ্ছল শিক্ষার্থী

১০.সম্ভাবনাময় প্রাণ

১১.শিক্ষকদের হন্টন প্রতিযোগিতা

১২.বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৩.স্মৃতি পরীক্ষা

১৪.বিজয় উল্লাস

১৫.সবুজ দলের একাংশ

১৬.শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার ও সভাপতি

১৭.লাল দলের একাংশ

১৮.শ্রেণিকক্ষে পাঠদান

১৯.শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

২০.ল্যাবরুমে শিক্ষার্থী

২১.লালদলের র‍্যালী

২২.সমুদ্র সৈকতে জলের ছোঁয়া

২৩. জাতীয় পতাকা উত্তোলনে সভাপতি

২৪.শিক্ষা সফরে হোটেলের সামনে

২৫.বসন্ত বরণ

২৬.বাৎসরিক সফর-সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান

২৭.ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চেয়ারম্যান কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ

২৮.নবীনবরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান স্যারের বক্তব্য

২৯.ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রানার্স আপ দলকে চেক প্রদান

৩০.বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষকমণ্ডলী

৩১.ফুটবল টুর্নামেন্টের শেষ মুহূর্ত ও আনন্দ উল্লাস

৩২.হোটেল লজের সামনে শিক্ষার্থীরা

৩৩. সবুজ দলের র‍্যালী

৩৪. হলুদ ও লাল দল

৩৫.বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন

৩৬.লাল, হলুদ ও সবুজ দলের বিজয়

৩৭.শিক্ষার্থীদের মোরগ লড়াই

৩৮.শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা

৩৯.শিক্ষকদের মোরগ লড়াই

৪০.হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

৪১.'যেমন খুশি তেমন সাজ' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

৪২.পুরস্কার বিতরণ

৪৩.ফুলেল শুভেচ্ছা

৪৪.শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

৪৫.ট্রফি প্রদান

৪৬.বিজয়ী দলের আনন্দ উল্লাস

৪৭.কলেজ কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা

৪৮.শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একাংশ

৪৯. কো-অর্ডিনেটর ও শিক্ষার্থী

৫০. কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে শিক্ষকদের সাক্ষাৎ

৫১.শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাউন্সিলিং পর্ব

৫২.শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্ব

৫৩.শিক্ষকমণ্ডলীর আলোচনা মুহূর্ত

৫৪.চেয়ারম্যান স্যারের ক্রেস্ট প্রদান

৫৫.ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

৫৬.অধ্যক্ষ স্যারের সহধর্মিণীর সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলীর একাংশ

৫৭.র‍্যাগ ডে-২০২২

৫৮.অধ্যক্ষ মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

৫৯.র‍্যাগ ডে এর আনন্দঘন মুহূর্ত

৬০.কলেজ ক্যাম্পাসের সম্মুখে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

পুবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
www.pubalibangla.com
63 Years in Banking 1959 - 2022

"পুবালী ব্যাংকে সঞ্চয় করুন
নিরাপদে থাকুন"

সর্বাধিক শাখা । সর্ববৃহৎ অনলাইন নেটওয়ার্ক
সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি । সর্বাধুনিক তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ফ্রি অনলাইন । ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং । ফ্রি ইজিপি

- অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, সমৃদ্ধ মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার যথার্থ পরিপালন।
- ডাবল এ প্লাস (AA+) ক্রেডিট রেটিং।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে
অনলাইন ব্যাকিং এ ১ম
এজেন্ট ব্যাংকিং এ ১ম
রেমিট্যান্স আহরণে ১ম

অগ্রণী বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়ক ঋণ

পরপর ৩ বছর আইসিএবি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী

অগ্রণী সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস ও এপিএস)

বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন

এটিএম সার্ভিস

এসএমই লোন নারী অগ্রণী

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ বিজয়ী

সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় " রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং" এর আওতায় সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন একক ব্যাংকের অনলাইন সেবাভুক্ত শাখার সংখ্যার বিচারে এটি সর্বোচ্চ।

সরকারী কোষাগারে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতিতে (Automated Challan System) টাকা জমা দেয়ার সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

আমানত সেবাসমূহ
- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- স্বল্প মেয়াদী আমানত
- স্থায়ী আমানত
- অগ্রণী ব্যাংক পেনশন স্কীম (এপিএস)
- অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস)
- অগ্রণী এডুকেশন স্কীম
- অগ্রণী সুপার সেভিংস স্কীম

ঋণ সেবাসমূহ
- শিল্প বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- কৃষি/পল্লী ঋণ (৪%, ৪.৫০% ৫% এবং ৮.৫% হারে)
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ
- মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ
- শিল্প ঋণ/মেয়াদী ঋণ
- আমদানি/রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- এসএমই লোন, নারী অগ্রণী ঋণ
- অগ্রণী বিদেশ গমন ঋণ (৯% সুদ)
- পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ (৯% সুদ)
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ
- Personal Loan

অন্যান্য সেবাসমূহ
- ১০ টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা
- বিশ্বের সকল দেশ থেকে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ তাৎক্ষনিক পরিশোধের ব্যবস্থা
- সকল ব্যাংকের ATM বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা
- যে কোন সময়ে রেমিট্যান্সের অর্থ উত্তোলনের জন্য রয়েছে "প্রবাসী অগ্রণী রেমিট্যান্স কার্ড"
- ৪০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট আপনাদের দোর গোড়ায় এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরাই ১ম।
- সকল শাখার মাধ্যমে E-GP ই-টেন্ডারিং সুবিধা প্রদান
- BEFTN I RTGS সেবা চালু আছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
www.agranibank.org

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
"স্বয়ংক্রিয় চালান" প্রক্রিয়ায়

পাসপোর্ট ফি | আয়কর | ভ্যাট
শুল্ক | সারচার্জ | অন্যান্য সেবা ফি

তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।
আজই "স্বয়ংক্রিয় চালান" পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

সময়ের সাথে, সম্পর্কের সাথে,
ফেলে আসা স্মৃতি, বদলে যাওয়া গল্প বা
কখনো না বদলানো মায়ের মমতায়
প্রাণের নানা খাবারের
বর্ণিল স্বাদে উদ্‌যাপিত হোক
আপনার প্রতিদিন,
প্রতি মুহূর্ত
জীবনের স্বাদ
প্রাণ
জীবনের স্বাদ
pranfoods.net pranrflbd pran-rfl-group 09613737777

উত্তরণ লাখপতি ও মিলিয়নিয়ার সঞ্চয় প্রকল্প
লাখপতি বা মিলিয়নিয়ার হোন ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে
প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য
◆ আকর্ষণীয় সুদের হার
◆ একক ও যৌথভাবে হিসাব খোলার সুবিধা
◆ বিশেষ নির্দেশনার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসিক কিস্তি প্রদান
◆ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনলাইনে মাসিক কিস্তি জমাদানের সুবিধা
◆ ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মাসিক কিস্তি জমাদানের সুবিধা
◆ সঞ্চয়ের বিপরীতে ঋণের সুবিধা
আমাদের অন্যান্য সেবা সমূহ
◆ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা
◆ এস.এম.এস ব্যাংকিং সুবিধা
◆ ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা
◆ ভিসা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড
◆ ভিসা প্রিপেইড কার্ড
বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন
অথবা ভিজিট করুন www.uttarabank-bd.com
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত